রূপের-ফাঁদ

৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
ঠনঠনে কালীতলা।

রূপের ফাঁদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির
শাখা—৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ৫০০০ (সুধীর প্রেস) আশ্বিন, ১৩৩২।
দ্বিতীয় সংস্করণ ২৫০০ (অবসর প্রেস) অগ্রহায়ণ, ১৩৩২।

PRINTED BY :—M. C. Pattra, at the Abasar Press.
37, Kali Prasad Dutt Street, Calcutta.

সাহিত্যিক-সঙ্ঘ

সমগ্র ভারতবর্ষ-মধ্যে একমাত্র কমলিনী-সাহিত্য মন্দিরের লেখক্যতালিকাই সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট। সারা বাংলার মধ্যে বাংলার একডাকে-চেনা সুলেখক ও লেখিকাবৃন্দের এমন একত্র সমাবেশ আর কোথাও নাই।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী
অনুরূপা দেবী
নিরুপমা দেবী
শৈলবালা ঘোষজায়া
স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (উপন্যাস-সম্রাট)
„ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। (মানসী-সম্পাদক)
„ দুর্গাদাস লাহিড়ী। (বর্ত্তমান যুগের বেদব্যাস)
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (ভূতপূর্ব্ব প্রবাসী-সহ-সম্পাদক)
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ (নাট্যাচার্য্য)
„ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ। (উপন্যাসাচার্য্য)
„ সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। (বেদান্তশাস্ত্রী)
শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। (ঐতিহাসিক উপন্যাস-ছত্রপতি)
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ। (বসুমতী-সম্পাদক)
„ দীনেন্দ্রকুমার রায়। (রহস্য-লহরী-সম্পাদক)
„ কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম-এ। (ভূতপূর্ব্ব মালঞ্চ-সম্পাদক)
„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল। (ভূতপূর্ব্ব ভারতী-সম্পাদক)
„ ফণীন্দ্রনাথ পাল, বি-এ। (যমুনা-সম্পাদক)
„ পাঁচকড়ি দে। (ডিটেক্‌টিভ-সাহিত্য-রথী)
„ মনোমোহন রায় বি-এল। (রিজিয়া-প্রণেতা)
„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিম-ভ্রাতুষ্পৌত্র)
„ রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। (বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষৎ-সম্পাদক)
„ শরৎচন্দ্র পাল (পরিচালক)

চিত্র-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার,
„ নলিনকৃষ্ণ দাস ও নরেন্দ্রনাথ সরকার ইত্যাদি।

প্রতি মাসেই সাহিত্য-জগদ্বরেণ্য উল্লিখিত সুলেখক-লেখিকাবৃন্দের একখানি করিয়া উপন্যাস—পূর্ব্বের মতই আপনাদের হাতে দিতে পারিব।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত, শ্রীশরৎচন্দ্র পাল স্বত্বাধিকারী—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির।

বিজ্ঞাপন

কোনো শব্দের গোড়ায় ে এইরূপ একার-চিহ্ন থাক্‌লে সেটিকে অ্যা উচ্চারণ কর্‌তে হবে, এবং ে এইরূপ একার-চিহ্ন থাক্‌লে এ উচ্চারণ কর্‌তে হবে; যেমন দেখে (ে=দ্যাখে এবং দেখে।

ঢাকা
১ আশ্বিন ১৩৩২
মহালয়া

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
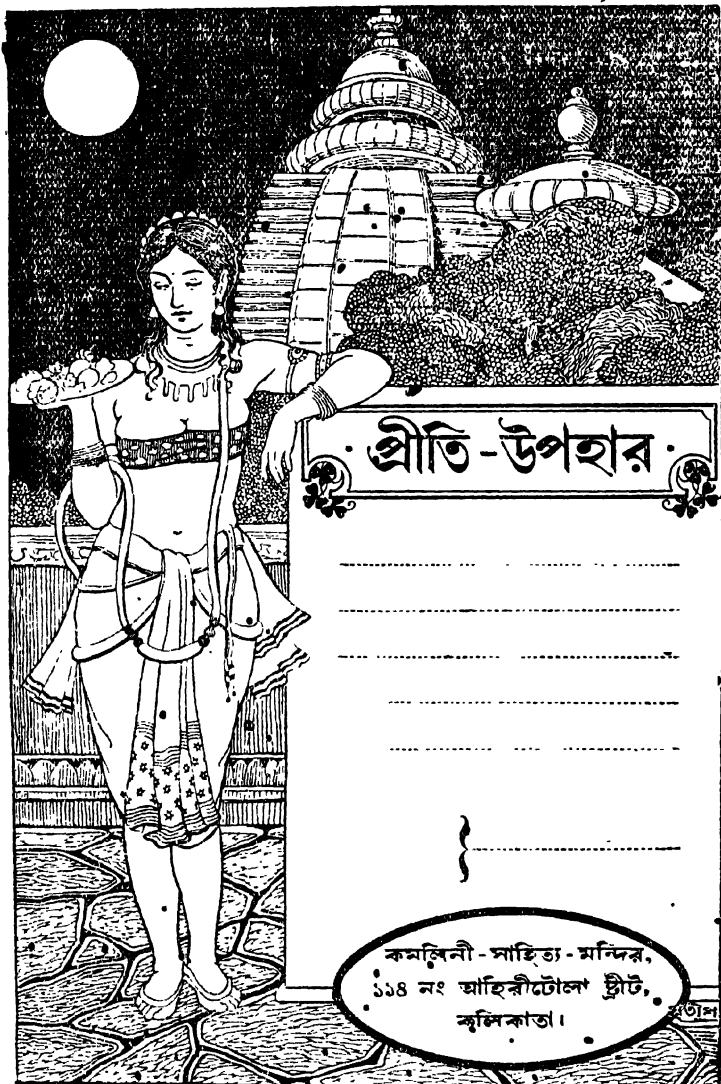
প্রীতি-উপহার
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

—ভ্রাতৃকল্প—

শ্রীমান্ গিরিজাকুমার বসু

ও

শ্রদ্ধেয়া স্নেহশীলা বান্ধবী

শ্রীমতী তমাললতা বসু

মহাশয়ার

করকমলে

প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ

—এই গ্রন্থ—

উৎসর্গ

করছি

রূপের ফাঁদ

"'রূপের' ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!"

গুঞ্জরা নদীর ধারে ছায়ানিবিড় ছোট্ট গ্রাম রুদ্রা। গ্রামের নাম রুদ্রা হলেও তার জীবনযাত্রায় রৌদ্ররস কিছুমাত্র ছিল না; তার তলবাহিনী নদী গুঞ্জরীর যাত্রায় যেমন ধীর প্রবাহ ছিল, কিন্তু বেগ ছিল না, তেমনি এই রুদ্রা গ্রামের লোকগুলির জীবনযাত্রা নিরুদ্বেগে উত্তেজনাহীন একঘেয়ে প্রবাহে অতিবাহিত হত, তাদের জীবনের আজের সঙ্গে কালের কিছুমাত্র পার্থক্য দেখা যেত না। এই গ্রামের ইতিহাসের মধ্যে সব চেয়ে উত্তেজনার যে ব্যাপার ঘটেছিল তা বছর চারেক আগে নবীন ময়রার ভিয়েনের ঘি জ্বলে' উঠে তার চালে আগুন ধরে' যাওয়া। এই অসাধারণ ঘটনায় ক্ষণেকের জন্য রুদ্রা গ্রাম রুদ্রমূর্ত্তি ধরে' গ্রামের সকলকে উত্তেজনায় উদ্বুদ্ধ করে' তুলেছিল; কিন্তু মা-বাপ-মরা আত্মীয়ের গলগ্রহ অনাথ ছেলেটা নিজের প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে জ্বলন্ত ঘরটাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিবিয়ে ফেলাতে সে-আগুন আর বিস্তৃত হতে পারে নি, এবং সেই একখানা ঘরের পোড়া ছাই জুড়িয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত গ্রামের উত্তেজনাও জুড়িয়ে গিয়েছিল। তার পরে বছরখানেক আগে

হরিপ্রসন্ন মুখুজ্জের বাড়ীতে রাত দুটোর সময় চোর চোর বলে' চীৎকার হওয়াতে সমস্ত গ্রাম একবার উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শীঘ্রই জানা গেল চোর-টোর কিছু না, একটা হুতুমপেঁচা পাখী ধপ করে' এসে হরিপ্রসন্নের ঘরের জানলার পাশের পেয়ারা-গাছটাতে বসাতে হরিপ্রসন্ন ঘুমের ঘোরে চম্‌কে উঠে চোর চোর বলে' চেঁচিয়ে উঠেছিল। এই নিয়ে হরপ্রসন্নকে গাঁয়ের লোকে দু-চার দিন ঠাট্টা করবার সুযোগ পেয়েছিল—সেটাও এই গ্রামের বৈচিত্র্যহীন জীবনে কম লাভ নয়।

কিন্তু গত ছ-মাসের মধ্যে এই পুরাতনের কোলে লালিত গ্রামখানিতে ক্রমাগতই নূতনের উপদ্রব হতে আরম্ভ হয়েছে; এই-সব নূতন ঘটনায় উত্তেজনার কোনো কারণ না থাকলেও নূতনত্বের বিস্ময়ে সমস্ত গ্রামবাসী নিজেদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

তাদের প্রথম বিস্ময়ের কারণ হয়েছিলেন জলধর-বাবু। বছর কুড়ি আগে তাঁর বাবা একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে জলধর, তোর গলার পৈতে কি হল?

জলধর লজ্জিত মুখ নীচু করে' উত্তর দিয়েছিলেন—ফেলে দিয়েছি।

তাঁর পিতা পুত্রের এই উত্তরে ক্রুদ্ধই বেশী হয়েছিলেন অথবা বিস্মিতই বেশী হয়েছিলেন তা জলধর ঠিক বুঝতে পারেন নি; তাঁর বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—পৈতে ফেলে দিয়েছি! এর মানে কি?

জলধর নম্র মৃদুস্বরে বললেন—আমি শাস্ত্র পড়ে' দেখলাম পৈতেটা উত্তরীয়ের ক্ষীণ অবশেষ; এখন ত আমাদের গায়ে প্রায় সব সময়েই জামা আর উত্তরীয় থাকে, তাই অনাবশ্যক মনে করে' পৈতেটাকে আর রাখিনি।

তাঁর পিতা চোখ কপালে তুলে ক্রুদ্ধস্বরে বলে' উঠলেন—ভারি শাস্ত্র-

বাগীশ হয়েছিস্! আজ উপোষ করে' থাক্‌বি, কাল প্রায়শ্চিত্ত করে' আবার তোকে পৈতে নিতে হবে।

জলধর মৃদু নম্র অথচ দৃঢ় স্বরে বল্‌লেন—যে-কাজ আমি ভেবে চিন্তে করেছি, যে-কাজকে আমি অন্যায় মনে করি না, তার জন্যে আমি কোনো রকম প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার কর্‌তে পার্‌ব না।

জলধরের পিতা ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত জ্বলন্ত আগুনের মতন উত্তেজিত হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—তুই তবে ব্রাহ্ম, না খৃষ্টান, কি হবি?

জলধর-বাবু বল্‌লেন—কিছুই হব না, যা আছি তাই থাক্‌ব।

তাঁর পিতা ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লেন—তুমি যেমন খুশী তেমন থাক্‌তে পারো, কিন্তু আমার বাড়ীতে তোমার খুশী মতন থাকা আজ থেকে আর চল্‌বে না।

জলধর-বাবু আর একটি মাত্র কথাও না বলে' পিতাকে প্রণাম করে' এক কাপড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

জলধর-বাবু পশ্চিমে গিয়ে নিজের একার চেষ্টায় সামান্য কর্ম্ম থেকে আরম্ভ করে' ক্রমশ নিজের অধ্যবসায়গুণে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। সেইখানেই তিনি তাঁরই মতন একজন সমাজবিদ্রোহীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর দুটি মাত্র কন্যা—ধীরা ও নীরা; এবং একটি মাত্র পুত্র কিশোর—সেই সর্ব্বকনিষ্ঠ।

মাস ছয় আগে জলধর-বাবু সংবাদ পেলেন যে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে; তিনি তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করে' যান নি, পৈতৃক সম্পত্তি সমস্তই তিনি পাবেন। এই খবর পেয়ে জলধর-বাবু স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে কুড়ি বৎসর পরে আবার দেশে ফিরে এসেছেন।

তাঁর আগমনে গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না, উত্তেজনায় তাদের

একঘেয়ে জীবন উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কারণ, তাঁর কন্যা ধীরার বয়স আঠার, এবং নীরার বয়স চোদ্দ, তবু তাদের বিয়ে হয় নি। এত বড় ধেড়ে হাতীর মতন মেয়ে বাড়ীতে পুষে রেখে বুড়ো-বুড়ীর ঘুমই বা কি করে' হচ্ছে আর অন্নই বা মুখে কি করে' রুচ্ছে এই ভেবে ভেবে গাঁয়ের লোকেরাই আহার নিদ্রা ত্যাগ কর্‌তে বসেছিল।

গাঁয়ের লোকদের দ্বিতীয় বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল বনবিহারী ডাক্তার। সে এ-গ্রামের লোক নয়; জলধর-বাবুরা বিদেশ থেকে স্বগ্রামে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বনবিহারী ডাক্তারও এই গ্রামে এসে বাস কর্‌তে আরম্ভ করেছে। তার নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে শুধু বলে বনবিহারী; পদবী জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে—জানি না; জাতি জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে—জানি না; বাপের নাম জিজ্ঞাসা করলেও বলে—তাও জানি না। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে' জানা গেছে কল্‌কাতার এক ধনী ভদ্রলোক তাঁর দমদমার বাগান-বাড়ীতে গাছের ঝোপের মধ্য থেকে তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তখন সে নিতান্ত শিশু; তিনি বনবিহারীকে মানুষ করেছেন, তিনিই তাকে নাম দিয়েছেন বনবিহারী, তিনিই তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তিনিই তাকে বলেছেন যেখানে কোনো ভালো ডাক্তার নেই সেখানে গিয়ে পীড়িতদের চিকিৎসা করে' তাকে তাঁর ঋণ শোধ কর্‌তে হবে। তাই সে এই গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে।

এই পিতৃপরিচয়হীন গোত্রহীন লোকটির অসঙ্কোচে সত্য ব্যক্ত কর্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধা বা লজ্জা বোধ হয় না, এই অতিবড় আশ্চর্য্য ব্যাপার সমস্ত গ্রামকে বিক্ষুব্ধ করে' তুলেছিল, এবং যার জন্মের ও বাপের ঠিক নেই এমন লোকটিকে নানা প্রকারে ধিক্কার দেবার ও লাঞ্ছনা কর্‌বার প্রবল প্রলোভন সকলকেই ব্যস্ত চঞ্চল করে' তুলেছিল; কিন্তু লোকটা ডাক্তার মানুষ

ছেলেপিলে নিয়ে ঘরকন্না করতে হয়, শরীর-গতিকের কথা ত বলা যায় না, কখনও হয়ত ডাক্তারকে ডাকতে হতে পারে, এই স্বার্থবুদ্ধিতে গ্রামের সকলে প্রকাশ্যে ডাক্তারের নিন্দাবাদ করতে না বটে, কিন্তু তারা সকলে মিলে নিরন্তর যে কানাঘুষা করত তার গুঞ্জন বাতাসে ভেসে এসে ডাক্তারের কর্ণে মুহুর্মুহু প্রবেশ করত; এবং সকলে যে সযত্নে তার লজ্জাদিগ্ধ অস্তিত্বকে অস্বীকার ও পরিহার করে' চলত তা বুঝতেও ডাক্তারকে বেশী কষ্ট করতে হত না। গ্রামের সামাজিক জীবনের সঙ্গে ডাক্তারের কোনো যোগ ছিল না; পীড়ার যন্ত্রণা বড় বালাই, তার তাড়নায় মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের বাড়ীতে ডাক্তারের ডাক পড়ত, এবং গরজ ফুরিয়ে গেলেই ডাক্তারের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকত না। ডাক্তারের দর্শনী ও ঔষধের দাম যে যা দিত ডাক্তার বিনা আপত্তিতে প্রফুল্লমুখে তাই গ্রহণ করত; যারা নিজের অসামর্থ্য জানাত তাদের কাছ থেকে সে কিছুই নিত না; অনেক রোগীকে সে পথ্য পর্য্যন্ত জোগাত। গ্রামের লোকে ক্রমে ক্রমে যখন বুঝতে পারলে যে ডাক্তারের দর্শনী ও ঔষধের দাম দিলেও চলে, না দিলেও চলে, তখন না-দেওয়াটাই বেশী চলতে লাগল। যাকে সকলে ঘৃণিত ও উপহাস্য মনে করে' তাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করে' চলত, তার কাছ থেকে সেবা ও সাহায্য নিতে কারোরই এতটুকু কিন্তু-বোধ হত না।

গ্রামবাসীদের তৃতীয় বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল—যে ডাক্তারকে সকলে ঘৃণ্য ও পরিহর্ত্তব্য বিবেচনা করত এবং রোগের দায়ে না ঠেকলে তাকে বাড়ীর চৌকাঠ-ডিঙোতে দিত না, সেই ডাক্তারকে জলধর-বাবু সম্মান করেন, সমাদর করেন, বাড়ীতে অকারণে নিমন্ত্রণ করেন, বিনা নিমন্ত্রণে স্ত্রীকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই যেয়ে থাকেন।

গ্রামের বিজ্ঞেরা বিদ্রূপের 'হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে বলে' থাকেন—যদ্ যেন যুজ্যতে লোকে।

গ্রামবাসীদের চতুর্থ বিস্ময়—গুঞ্জরী নদীর তীরে অকস্মাৎ একখানি ছোট অথচ সুন্দর ছবির মতন বাড়ী নির্ম্মিত হয়েছে, সেই বাড়ীটিকে ঘিরে মনোরম একটি বাগান রচিত হয়েছে, এবং সেই বাড়ীতে এসে বাস করছে একটি তরুণ যুবা ও একটি তরুণী যুবতী। তারা বাড়ী থেকে বেরোয় না, বাইরের কাউকেও বাড়ীতে ঢুকতে দেয় না; তাদের চাকর দাসী সব বিদেশী, তাদের কাছেও জিজ্ঞাসা করে' বাড়ীর বাসিন্দাদের কোনো পরিচয় পাবার জো নেই—তারা বলে তারাও বাবুর আর গিন্নির কোনো পরিচয় জানে না, নাম পর্য্যন্ত জানে না; তারাও অল্প দিন হল নিযুক্ত হয়ে এসেছে। এই রহস্যনিকেতনকে গ্রামের লোকেরা বলে পরীর বাড়ী—কারণ, বাড়ীর যে-অধিকারিণী সে পরীর মতন সুন্দরী, পরীর মতন সে কল্পনার ধন।

*

*　　*

যৌবনের ধর্ম্ম যেখানে রহস্য তার মধ্যে উঁকি মারা, যেখানে সৌন্দর্য্য সেখানে উপাসক হয়ে উপস্থিত হওয়া এবং যেখানে বিঘ্ন ও বাধা তাকে অতিক্রম করা ও উত্তীর্ণ হওয়া। জলধর-বাবুর বাড়ীতে সুন্দর ও রহস্যের সমাবেশ হয়েছিল, তাঁর দুই কন্যাতে এবং বাধার গণ্ডী ঘিরে রেখেছিল গাঁয়ের জাত-রক্ষার অভিভাবকেরা। গ্রামের যুবকেরা অভিভাবকদের গণ্ডী লুকিয়ে চুরিয়েও হয় ত অতিক্রম করতে পারত, কিন্তু জলধর-বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা ধীরার মুখে ও চাল-চলনে যে একটি কোমল গাম্ভীর্য্য ও শালীন শুচিতা দেদীপ্যমান হয়ে থাকত তার কাছে চপল কৌতূহলে অগ্রসর হতে কেউ সাহস করত না। কেবল মাত্র সাহস করেছিল বনবিহারী ডাক্তার

রূপের ফাঁদ

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিয়ে। তারা দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা ও সম্মান কর্‌ত, কারণ, জাতের ও মতের বাধা তাঁদের দুজনের মধ্যে ছিল না।

ধীরার কাছে ঘেঁষ্‌তে সাহস না পেয়ে গ্রামের তরুণেরা নীরার কাছে জুটে যাবার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠেছিল, এবং তারা জুটে যেতেও পারিত; কারণ, নীরার বয়স ছিল অল্প, স্বভাব ছিল চঞ্চল, এবং চিত্ত ছিল চটুল। কিন্তু নীরার কাছেও তাদের ঘেঁষ্‌বার সুযোগ ও সাহস হত না, কারণ, নীরাকে পাহারা দিত তার পিতামাতা এবং তার দিদির নির্ব্বাক্‌ কোমল গাম্ভীর্য্য। তৎসত্ত্বেও নীরার সতত-সঙ্গী হয়ে উঠেছিল দুটি তরুণ—অনাথ আর প্রচুর—তারা নীরার প্রায় সমবয়সী বলে' তারা বেশী বাধা পায় নি; অধিকন্তু অনাথকে নীরার বাড়ীর সকলেই বিশেষ স্নেহের চোখে দেখ্‌ত,—ছেলেটি শান্ত শিষ্ট সভ্য ভব্য পরোপকারী, স্কুলে না গিয়েও সে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখেছিল ঐ বয়সের ছেলেরই উপযুক্ত এবং আরো শেখ্‌বার আগ্রহ ছিল তার অদম্য; আর প্রচুর ছিল জলধর-বাবুর বাল্যবন্ধুর ছেলে, কাজেই সে নীরাদের আত্মীয়।

অনাথ ছেলেটি বাস্তবিকই অনাথ—ছেলেবেলাতেই তার মা-বাপ মারা যায়। তাকে মানুষ করেছে গ্রামেরই এক বন্ধ্যা, তাকেই সে মা বলে আর তার স্বামীকে বলে পিসে-মশায়—তার নাম নরসিংহ। অনাথ যে নরসিংহের স্ত্রী শারদাকে মা আর তার স্বামীকে পিসে-মশায় কেন বলে তার একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। শারদা তার এক ভাইয়ের ছেলেকে কাছে রেখে বন্ধ্যার বাৎসল্যক্ষুধা পরিতৃপ্ত করবার চেষ্টা করছিল; সেই সময়ে শারদা পিতৃমাতৃহীন অনাথকেও নিজের স্নেহচ্ছায়ে আশ্রয় দান করে। শারদার ভাইপো কার্ত্তিক শারদাকে পিসিমা আর নরসিংহকে পিসে-মশায় বলে' ডাকৃত; শুনে শুনে অনাথও সেই একই সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছিল।

নিজের সন্তান না থাকলে পুরুষের চিত্ত শুষ্ক কঠোর হয়ে ওঠে, অর্থসঞ্চয়ই তার তখন একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়; কিন্তু রমণীর চিত্ত নিরুদ্ধ স্নেহকে প্রমুক্ত করবার তীব্র আবেগে পরের ছেলেকেও আপনার করতে পারলে যেন বেঁচে যায়। তাই শারদা যখন একটা ছেলেতেও সন্তুষ্ট না থেকে আবার আর-একটা ছেলেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল, তখন নরসিংহ অনাবশ্যক অতিব্যয়ের আতঙ্কে তাদের তিনজনের উপরেই চটে' গেল; তার খিট্‌খিটে মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়ে' উঠ্‌ল। তার পর অল্পদিন বাদে কার্ত্তিক যখন শারদাকে কাঁদিয়ে মরে' গেল, তখন নরসিংহ মনে মনে খুশী হয়ে হাঁপ ছেড়ে বল্‌লে—যাক, একটা আপদ ত সর্‌ল; আর-একটা ঝট্‌পট সর্‌লেই বাঁচি; শারী মুখপুড়ী ছেলে দুটো নিয়েই ব্যস্ত, আমার দিকে একবার ফিরেও তাকায় না, আমি যেন এখন তার কাছে বাতিল হয়ে গেছি।

শোকাতুরা শারদা অনাথকে বল্‌লে—বাবা, আজ থেকে তুই আমাকে মা বলে' ডাকিস। পোড়াকপালীর অদৃষ্টে তুইও হয়ত বেশীদিন বাঁচ্‌বি না, যে ক'দিন আছিস আমাকে মা বলে' ডেকে আমার জীবনের প্রধান সাধটা একটু মিটিয়ে দে।

অনাথ মাঝে মাঝে ভুল করে' আর শারদার সস্নেহ তিরস্কারে সংশোধিত হয়ে এখন শারদাকে মা বলে'ই ডাকে; কিন্তু নরসিংহকে পিসেই বলে। অনাথের উপর নরসিংহের বিরাগ এতে আরো প্রবল হয়ে উঠেছে; একদিন অনাথ তাকে পিসে-মশায় বলে' ডাক্‌তেই সে সিংহের মতন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল—বেটা হারামজাদা সয়তান কোথাকার! মার স্বামী পিসে-মশায়! ফের যদি পিসে-মশায় বলে' গাল দিবি ত তোর হাড় একজায়গায় আর মাস একজায়গায় করে' থোব।

অনাথ কথা ফুটে অবধি শারদাকে পিসিমা আর নরসিংহকে পিসে-

মশায় বলে' এসেছে; শারদার ডাকের প্রথমাংশ পিসি-টুকুন মাত্র খসে' গিয়েছে, শেষাংশ মা পূর্ব্ববৎ বজায় আছে। কিন্তু নরসিংহের ডাক পিসে-মশাইয়ের কোন্‌টুকু ছেড়ে কোন্‌টুকু রাখ্‌তে হবে তা কিছু না বলে' দিয়েই নরসিংহ তাকে যে রকম করে' খিঁচিয়ে উঠ্‌ল তাতে শিশু ভয় পেয়ে ভীষণ ভড়্‌কে গেল; সে নরসিংহকে সিংহের চেয়েও ভয়ঙ্কর বিবেচনা কর্‌ত; সাধ্যপক্ষে সে তার কাছেও যেত না, কোনো রকম সম্বোধনও কর্‌ত না; এখন সে-পাঠ একেবারেই তুলে দিলে। যদি বা বাধ্য হয়ে নরসিংহকে কিছু বল্‌তে হত তা হলে সে একেবারে নরসিংহের সাম্‌নে গিয়ে বিনা সম্বোধনে কেবল মাত্র বক্তব্যটি বলে'ই সরে' পড়্‌ত, কোনো সম্বোধনই কর্‌ত না। এতেও অনাথের উপর নরসিংহের তর্জন-গর্জনের অন্ত ছিল না। অনাথ আশ্রয়দাতার কাছ থেকে ক্রমাগত ভৎর্সিত হয়ে হয়ে অত্যন্ত নিরুৎসাহ ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। শারদা অনাথকে স্কুলে দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে'ও স্বামীর মত্‌ করাতে পারে নি, নরসিংহ কিছুতেই একটা মাওড়া কুড়ানো ছেলের জন্যে বাজেখরচ কর্‌তে রাজী হয় নি। অনাথ একটু বড় হয়ে উঠ্‌তেই নরসিংহ তাকে তাদের গ্রামের মতি-বেনের দোকানে ভর্ত্তি করে' দিয়েছিল—নিষ্কর্ম্মা হয়ে পরের গণ্ডে পা দিয়ে বসে' বসে' না খেয়ে নিজে খেটে রোজ্‌গার করে' খাক। বালক অনাথ মতি-বেনের দোকানে খদ্দেরদের জিনিস এগিয়ে দিত আর তার বদলে পাঁচ টাকা করে' মাইনে পেত; মাইনের পাঁচটি টাকাই নিয়ে গিয়ে তাকে নরসিংহের থাবায় সঁপে দিতে হ'ত, একখানা ঘুড়ি বা একটা লাট্টু কেন্‌বার জন্যে তার প্রবল বাসনা হলেও একটা পয়সাও সে পেত না। এই রকমে শৈশব থেকেই তাকে ইচ্ছা দমন কর্‌তে শিখ্‌তে হয়েছিল।

প্রচুর ধনীর ছেলে; বিধবা মায়ের সবে-ধন-নীলমণি বলে' তার আদরের ও প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না। বেনের দোকানের চাকর দরিদ্র অনাথের প্রতি প্রচুরের অবজ্ঞা ছিল প্রচুর। অনাথ বেচারা অপরাধীর মতন কুণ্ঠিত ভাবে নীরার কাছে আস্‌ছে দেখ্‌লেই প্রচুর এমন প্রচুর হাস্য করত যে তাতে কুণ্ঠিত অনাথ ভয়ে ও লজ্জায় একেবারে আধ-মরা হয়ে উঠ্‌ত। নীরার কাছেও অনাথ কিছুমাত্র উৎসাহ বা মমতা পেত না; প্রচুরের হাস্যের সঙ্গে তাল রেখে নীরাও হেসে উঠে অনাথকে একেবারে অপ্রস্তুত করে' ছাড়্‌ত। অনাথের উপর যে নীরার কোনো-রকম বিরাগ বা বিদ্বেষ ছিল তা নয়; প্রচুর কাছে না থাক্‌লে অনাথের প্রতি তার প্রসন্ন করুণা বর্ষিত হত,—কারণ উঁচু ডাল থেকে পেয়ারা পেড়ে দিতে, পাখীর বাসা থেকে পাখীর ছানা পাড়্‌তে, পুকুরে ডুব-সাঁতার দিয়ে গিয়ে অতর্কিতে সন্তরমান হাঁসের পা ধরে' টেনে তাদের চম্‌কে দিতে অনাথ সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কেবল নীরার মুখ থেকে একটু হুকুমের অপেক্ষা। নীরার প্রসন্নতা লাভ করবার জন্যে কেউ পাকা আম চোখে দেখ্‌বার আগেই অনাথ আমের বাগান পাতি পাতি করে' খুঁজে বৎসরের প্রথম পাকা আমটি এনে নীরাকে উপহার দিত; পদ্ম-দীঘিতে সাপের ভয় অগ্রাহ্য করে' সে পদ্ম আহরণ করে' আন্‌ত এবং ভক্তপূজারীর মতন সসঙ্কোচে ও সসম্ভ্রমে সেই পদ্মগুলিতে মালা গেঁথে নীরাকে উপহার দিতে আস্‌ত। প্রচুর না থাক্‌লে নীরা খুশী মনেই সেই মালা গলায় পর্‌ত, অনাথের সঙ্গে হাসিমুখে দু-চারটে কথাও বল্‌ত; কিন্তু প্রচুর উপস্থিত থাক্‌লে নীরা ঠোঁট উল্টে কেবল মাত্র বল্‌ত—"ভারি ত!" এই মন্তব্য শুনে প্রচুর হো হো করে' হেসে উঠ্‌ত, আর অনাথের মনে হত—হে ধরণী, দ্বিধা হও। প্রচুর নীরার সঙ্গে দেখা করতে

আস্‌বার সময় রোজই এমন উপহার নিয়ে আস্‌ত যা নীরার কাছে দুর্লভ অদৃষ্টপূর্ব্ব পরমবিস্ময়কর ; সে কোনো দিন তেকোণা শিশিতে মন্দিরের চূড়ার মতন কাঁচের ছিপি আঁটা ও গলার কাছে রেশমী ফিতার গ্রন্থি বাঁধা এসেন্স্‌, কোনোদিন বা রেশমী কাপড়ের গদি মোড়া চোকোলেটের বাক্‌স, কোনোদিন বা নানাবিধ ফলের আকারের ইটালীয়ান লজেন্‌চুষ, কোনোদিন বা উৎকট রকমের অশ্লীল ছবি দেওয়া বটতলার উপন্যাস 'পিরিতের কাঠপিঁপ্‌ড়ে' বা 'গুম্‌খুন' বা 'বেশ্যাসঙ্গীত' উপহার দিত। ধীরা নীরাকে সকল বই নির্বিচারে পড়্‌তে দিত না ; তাই প্রচুরের কাছ থেকে এই-সব নিষিদ্ধ পুস্তক উপহার পেয়ে নীরার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার অন্ত থাক্‌ত না ; সে বিছানার তলায় বইগুলিকে লুকিয়ে রাখ্‌ত, এবং একটু ফাঁক পেলেই দু-দশ লাইন যা পার্‌ত পড়ে' নিত। অনাথ বেচারা প্রচুরের প্রচুর উপহারের তলায় একবারে চাপা পড়ে' গিয়েছিল। একদিন অনাথ একমুঠো কচি ঘাসের মতন স্নিগ্ধ একটা সবুজ টিয়া-পাখীর বাচ্চা এনে প্রতিমার কাছে অঞ্জলি দেবার মতন দু হাতে করে' নীরার হাতে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় প্রচুর এসে তার পকেট থেকে বার করে' উঁচু করে' ধরে' নীরাকে দেখালে একটা বড় সিগার চুরুট ; নীরা অনাথের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে বলে' উঠ্‌ল—"চুরুট খেতে ধরেছ প্রচুর-দা, দাঁড়াও না তোমার মাকে বলে' দেবো।" নীরার কথা শেষ হতে না হতে প্রচুর চুরুটটার একটা প্রান্ত ধরে' একটু টান্‌তেই সেই চুরুটটা তৎক্ষণাৎ হয়ে গেল একখানা কাগজের ছবি-আঁকা পাখা। নীরা এই অদ্ভুত বিস্ময়কর পদার্থটি হাতে নিয়ে দেখ্‌বার জন্যে যে-হাত অনাথের উপহার নেবে বলে' বাড়িয়েছিল সেই হাত অনাথের দিক্‌ থেকে টেনে নিয়ে প্রচুরের দিকে বাড়িয়ে দিলে। টিয়া-পাখীর বাচ্চাটি অনাথের অঞ্জলিচ্যুত হয়ে

নীরার হাতের আশ্রয় না পেয়ে মাটিতে আছ্‌ড়ে পড়ে' গেল, আর আঘাত পেয়ে কাতর স্বরে চ্যাঁ চ্যাঁ করে' চীৎকার করে' উঠ্‌ল—সে যেন অনাথের আহত হৃদয়ের আর্ত্তনাদ! অনাথ তাড়াতাড়ি টিয়াটিকে তুলে নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধর্‌লে। নীরা টিয়ার চীৎকারে মুখ ফিরিয়ে অনাথের ব্যথিত মুখের দিকে তাকিয়ে রূঢ়স্বরে বল্‌লে—"তোমার ঐ টিয়াফিয়া ফেলে দাও গে, যদি এই রকম নতুন কিছু দিতে পারো নিয়ে এস, নয় ত তুমি আমার কাছে এস না।" প্রচুর নিজের বিজয়গর্ব্বে অট্টহাস্য করে' অনাথের পরাজয় ঘোষণা করে' দিলে। অনাথ চোরের মতন মাথা হেঁট করে' সেখান থেকে চলে' গেল।

এই রকমে অনাথের কাছে নীরা যতই দুর্লভ হয়ে উঠ্‌ছিল অনাথের প্রণয় ততই প্রবলবেগে নীরার প্রতি ধাবিত হচ্ছিল; অনাথ নীরার কাছে ঘেঁষ্‌তে আর সাহস করত না বটে, কিন্তু সে দূর থেকে মুগ্ধনেত্রে নীরাকে দেখেই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করত। নীরা তাকে বলেছে নূতন বিস্ময়কর কিছু না নিয়ে সে যেন তার কাছে না যায়। সে তার সামান্য অভিজ্ঞতা আলোড়ন করে' তার জ্ঞানের চৌহদ্দি এই গ্রামখানির মধ্যে নূতন কিছুই খুঁজে আবিষ্কার কর্‌তে পার্‌ছিল না। সে যে-দোকানে কাজ করত সেই মতি-বেনের দোকানে বেনেতি মশলা নুন কেরোসিন-তেল থেকে আরম্ভ করে' কাপড় জামা জুতো খড়ম ছাতা লাঠি কাগজ কলম খেলনা লজন্‌চুষ এমন কি দু-চারখানা স্কুলপাঠ্য বই পর্য্যন্ত বিক্রি হত—গাঁয়ের ছোটখাট হোয়াইট্‌ওয়ে লেড্‌ল'র দোকান আর কি। একদিন সে দোকানের এক খদ্দেরকে নানান রকম বিলাতী কাপড় দেখাতে দেখাতে একজোড়া কাপড়ের উপর দেখ্‌লে উজ্জ্বল বিবিধ বর্ণে ছাপা রাধাকৃষ্ণের একখানি পট আঁটা রয়েছে; এই দেখে তার মন

আনন্দে নৃত্য করে' উঠ্‌ল—এই ত নূতন! নূতনের সাক্ষাৎ সে পেয়েছে, কিন্তু তাকে সে লাভ করবে কেমন করে'? তার ছোট্ট বুকের মধ্যে উদ্বেগাকুল হৃদয় ধুক্‌ধুক্ করতে লাগল। সে দেখ্‌লে খরিদ্দার সেই ছবিওয়ালা কাপড় জোড়াই নির্ব্বাচন করলে। আশার আনন্দে অনাথের হৃদয় আবার নৃত্য করে' উঠ্‌ল। খরিদ্দার যখন দাম চুকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন অনাথ তার কাছে গিয়ে মুখ কাচুমাচু করে' বল্‌লে—"আমাকে ঐ ছবিখানা দিন না।" বালকের এই প্রার্থনায় খরিদ্দারের মনে নিজের সন্তানের এই ছবিটি পাওয়ার আনন্দের ছবি একবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল, পরক্ষণেই সে হেসে বললে—"খোকা, তুমি এই ছবিটা নেবে?" অনাথ কৃতার্থতার হাসি হেসে ঘাড় কাত করে' তার আগ্রহান্বিত সম্মতি জানালে। খরিদ্দার কাপড়ের উপর থেকে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে ছবিখানি খুলে অনাথের হাতে দিলে। অনাথের মুখে যে অভিনব আনন্দজ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল তা দেখে খুশী হয়ে খরিদ্দার চলে' গেল। ছবিখানি পেয়ে অনাথ ছট্‌ফট করতে লাগ্‌ল কখন সে ছুটি পাবে, আর সে ছুটে গিয়ে নীরাকে এই অপূর্ব্ব বস্তু উপহার দিয়ে চমৎকৃত করে' দেবে।

দুপুরবেলা দোকান থেকে খেতে যাবার ছুটি পেয়ে অনাথ আগেই নীরার সন্ধানে তাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল—তার তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা মনেও ছিল না। সে চোখ টিপে নীরাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গদ্‌গদ বচনে বল্‌লে—"আজ তোমার জন্যে ভারি একটি নতুন জিনিস নিয়ে এসেছি—এমন জিনিস তোমাকে প্রচুরও কখনো দিতে পারে নি।" নীরা উৎসুক হয়ে বল্‌লে—"কি অনাথ-দাদা? দেখি, দেখি।" অনাথ তার জামার পকেট থেকে সন্তর্পণে কাগজে জড়ানো সেই ছবিখানি

বার করলে, এবং নীরার উৎসুক মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাগজের ভাঁজ খুলে সেই ছবিখানিকে বার করে' নীরার দিকে বাড়িয়ে ধর্‌লে। নীরা পরম তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার স্বরে বলে' উঠ্‌ল—ও মা, এই! একখানা কাপড়ের পট! আমি মনে করি না-জানি কী হাতী ঘোড়া এনেছ!

অনাথ আহত অপ্রস্তুত হয়ে সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে' গেল। নিজেকে সে শত ধিক্কার দিতে লাগ্‌ল—তাই ত! সে কী নির্ব্বুদ্ধি! এই কাপড়ের পট যে কত সামান্য তা নীরা বলে' দেবার আগে কেন সে নিজে বুঝ্‌তে পারে নি। তার পরমভাগ্য যে আজ সেখানে প্রচুর উপস্থিত ছিল না।

অনাথ আবার নূতন বস্তুর সন্ধানে তার ক্ষুদ্র চেষ্টা নিয়োজিত করে' দিলে। কিছুদিন পরে তার মনিবের দোকানে এক চালান খেলনা এল, তার মধ্যে ছিল কতকগুলো চুম্বক লোহা, তার কাছে ছুঁচ কি ছোট লোহার টুকরো রাখ্‌লে সেটা টক করে' টেনে নেয়। এই দেখে অনাথের মনে যে বিপুল বিস্ময় উদ্রিক্ত হল তাতে তার মনে হল এই জিনিসটিকে তাচ্ছিল্য করে'ও নীরা এর নূতনত্ব অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। এই অপূর্ব্ব সামগ্রী তাকে একটি সংগ্রহ কর্‌তেই হবে। কিন্তু এই বস্তু ত কেবল মাত্র প্রার্থনায় কাপড়ের পটের মতন পাওয়া যাবে না—এ কিন্‌তে হবে দাম দিয়ে। যখন দোকানের সমস্ত নবাগত সামগ্রীর দাম ফেলা হচ্ছিল তখন সে উৎকর্ণ হয়ে শুন্‌লে এক-একটা চুম্বকের দাম বারো আনা। এই বারো আনা সংগ্রহ কর্‌তে না পার্‌লে ঐ দুর্লভ সামগ্রী কিছুতেই তার আয়ত্ত হবে না। সে মাসে পাঁচ টাকা মাইনে পায় বটে, কিন্তু সে ত নিজের বলে' পাঁচটা পয়সাও পায় না, গোটা পাঁচটা টাকাই

তাকে নরসিংহের থাবায় সঁপে দিতে হয়। তা যাই হোক, যেমন করে'ই হোক, তাকে এই বারো আনা পয়সা অবিলম্বে সংগ্রহ করতে হবে, অন্তত প্রচুর টের পেয়ে কিনে নিয়ে যাবার আগে।

সে বাড়ী গিয়ে শারদাকে বল্‌লে—মা, আমাকে বারো আনা পয়সা দেবে?

মার কাছে পয়সা থাকে না অনাথ জান্‌ত বলে' মার কাছে সে কোনওদিন একটা পয়সাও চায় নি, আজ অকস্মাৎ তাকে বারো আনা পয়সা চাইতে শুনে শারদা আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—বারো আনা? অত পয়সা কি করবি?

অনাথ কুন্ঠিত ধীর স্বরে বল্‌লে—আমার বিশেষ দরকার আছে।

শারদা আবার জিজ্ঞাসা করলে—কি দরকার?

অনাথ নিরুত্তর হয়ে মুখ নীচু করে' দাঁড়িয়ে রইল; সে তার দরকারের কথা তার মাকেও বিশ্বাস করে' বলতে পারলে না—কি জানি যদি তার অভিলাষ ব্যক্ত হয়ে পড়ে আর প্রচুর তা জেনে ফেলে। প্রচুরের ভয়ে সে ভালো করে' নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেল্‌তে পারছিল না।

শারদা অনাথকে নিরুত্তর থাকতে দেখে বল্‌লে—আমার কাছে ত একটা পয়সাও নেই বাবা।

এ-কথা অনাথ জান্‌ত; তবু সে নিরাশার মধ্যেও আশার সন্ধান করতে এসেছিল।

অনাথকে তখনো মাথা হেঁট করে' ম্লান কাতর মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শারদা বল্‌লে—তোমার কি দরকার ওঁকে গিয়ে বলো; তিনি যদি ভালো বোঝেন ত পয়সা দেবেন।

যমের মুখে যাওয়াও যা, আর কৃপণ নরসিংহের কাছে পয়সা চাইতে

যাওয়াও তা। কিন্তু আজ অনাথ মরীয়া হয়ে উঠেছিল, সে আগে থাকৃতেই ঠিক করে' এসেছিল যে মার কাছে সে ত পয়সা পাবেই না, সে একবার ঐ লোকটার কাছেও পয়সা চেয়ে দেখ্‌বে।

অনাথ দুঃসাহসে ভর করে' নরসিংহের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নরসিংহ তখন রোকড়ের খাতায় জমা-খরচ খতিয়ান করছিল। অনাথকে এসে দাঁড়াতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে—কি রে?

অনাথ নিশ্বাস রুদ্ধ করে' বল্‌লে—আমার বারো আনা পয়সা চাই।

নরসিংহ নাক থেকে চশ্‌মার সঙ্গে সঙ্গে চোখ পর্য্যন্ত কপালে তুলে জিজ্ঞাসা করলে—পয়সা! বারো আনা! কি হবে?

অনাথের দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল, সে অতি কষ্টে বল্‌লে—আমার দরকার আছে।

নরসিংহ গর্জ্জন করে' উঠ্‌ল—দরকার! কি দরকার?

অনাথ জান্‌ত যে নরসিংহকে দরকারের কথা খুলে না বল্‌লে তার কাছ থেকে পয়সা বার করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই; তাই সে তার গোপন অভিলাষ ফাঁকা হয়ে যাবার আশঙ্কা সত্ত্বেও বল্‌লে—আমি একটা চুম্বক লোহা কিন্‌ব।

নরসিংহ হাতের কলমটা কানে গুঁজে অনাথকে ডাক্‌লে—আয়, নিয়ে যা।

এত সহজে অভীষ্টসিদ্ধি হবে তা অনাথ ভাবে নি। এই অপ্রত্যাশিত সফলতায় তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল, সে তাড়াতাড়ি নরসিংহের কাছে এগিয়ে গেল। অনাথ তার কাছে যেতে না যেতেই নরসিংহ ঝুঁকে তার হাত বাড়িয়ে অনাথের কান ধরে' তাকে হিড়হিড় করে' কাছে টেনে নিয়ে গেল, আর দাঁতে দাঁত চেপে বলে' উঠ্‌ল—এই ত

পরীর রূপের ফাঁদে—বনবিহারী...(৬০ পৃষ্ঠা—২২ পংক্তি)

পেলি চুম্বকের হেঁচ্‌কা টান......” তার পর অনাথের পিঠে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক কিল গদাম করে' বসিয়ে দিয়ে বল্‌লে—আর এই নে লোহা !” তার পর আবার তার কান ধরে' আচ্ছা করে' ঝিঁকৃড়ে দিয়ে দূরে ঠেলে বলে' উঠ্‌ল—যাঃ, হারামজাদা নচ্ছার কোথাকার ! পয়সা অম্নি খোলামকুচি কি না ! বাবুর বেটা পদ্মলোচন চুম্বক কিনে পয়সা নষ্ট করবেন।

অনাথের সমস্ত সাহস এক কিলের ঘায়ে গুঁড়ো হয়ে গেল, এবং নরসিংহের হাতের ঝাঁকানি সে গুঁড়োটুকুও নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে দিলে। আশাভঙ্গের মনস্তাপ এবং অপমানের পরিতাপ বালককে একেবারে বিমূঢ় সঙ্কুচিত করে' ফেল্‌লে। তার তখন একমাত্র চিন্তা হল—আজকের মধ্যেই একটি চুম্বক তাকে সংগ্রহ করতেই হবে—কিন্তু কেমন করে' ? সমস্ত দিন ভেবে ভেবে সে যখন কিছুতেই কোনো উপায় আবিষ্কার করতে পার্‌লে না তখন সে স্থির করলে একটা চুম্বক সে চুরি করবে।

সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালা হলে দোকানে টাকার বাক্সর উপর ধুনুচী রেখে মতি বেনে যখন চক্ষু মুদে মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ প্রার্থনা করছিল সেই অবসরে অনাথ একটি চুম্বক সরিয়ে নিজের টেঁকে গুঁজে ফেল্‌লে। তার পর সে ছট্‌ফট করতে লাগ্‌ল কোন অবসরে ছুটে গিয়ে সে এই অপূর্ব্ব ও অপরূপ সামগ্রীটি নীরাকে উপহার দিয়ে তার প্রসন্নতার এক কণা লাভ করতে পারবে। তার ছুটি হবে রাত আটটার সময় ; ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে অনাথের প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল।

মতি বেনের প্রণাম শেষ হলে অনাথ গিয়ে তাকে ভয়ে ভয়ে মৃদু নম্র স্বরে বল্‌লে—আজ আমাকে একটু আগে ছুটি দেবেন ?

গ্রহণ করে; ধীরা ছোটলোকদের নোংরা বাড়ী ঘর বিছানা কাপড় পরিষ্কার করতে প্রবৃত্ত হয় আর সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নিয়মগুলি বিনা উপদেশে কেবল মাত্র নিজের আচরণের দ্বারা শিক্ষা দিতে থাকে। যাদের কেউ ছোঁয় না, আর যাদের কেউ দেখে না, তাদের সেবার মধ্যে দিয়ে ধীরা তাদের পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছিল; আর এর ফল হয়েছিল সমাজের আচারনিষ্ঠ জাতওয়ালাদের অধিকতর ঘৃণা ও ধিক্কার লাভ। জাতের অহঙ্কারে যারা নাক সিঁটকোয় তাদেরও দু-এক ঘরে আজকাল ধীরার ডাক পড়তে আরম্ভ হয়েছে—বিশেষতঃ সম্প্রতি গ্রামে যখন কলেরা লেগেছিল তখন অকস্মাৎ জাত্যভিমানীদের ধীরার প্রতি অনুরাগ প্রবল হয়ে উঠেছিল; কারণ, মায়ের চেয়েও অম্লানমুখে ধীরা ওলা-উঠার রোগীর সেবা করতে পারে। যেমন আঁতুড়ঘরে হাড়ী দাইকে ছোঁয়াছুঁয়ি করা অনিবার্য্য, কিন্তু হাড়ীর অস্পৃশ্যতা কিছুতেই ঘোচে না, হাড়ীর ছোঁয়াকে সকলেই যথাসাধ্য পরিহার করে' চলে, আর হাড়ীর ছোঁয়া জিনিস হয়ত একেবারে ফেলে দেয়, নয়ত তাকে নানান উপায়ে শোধন করে' গ্রহণ করে' ধীরার বেলাতেও সকলের মনের ভাব ছিল তেমনি; ধীরার কাছে যেতে হলে সকলে কাপড় গুটিয়ে সতর্ক হয়ে যায়, আর ধীরা কাছ দিয়ে চলে' গেলে তারা অঙ্গ সঙ্কুচিত করে' তফাতে সরে' যায়; ধীরাকে বাড়ীর সব জিনিস ছুঁতে দেওয়া হয় না, রোগীর সেবার জন্যে তার যা কিছু দরকার তা তাকে চাইতে হয়, এবং বাড়ীর লোক তা দূর থেকে আলগোছে তার হাতে ফেলে দেয়। রোগীর সেবার জন্যে কারো বাড়ীতে রাত্রি যাপন করতে হলে ধীরাকে যে শয্যা দেওয়া হয়, কারো মনে ভদ্রতার লেশমাত্র থাকলেও তা দিতে লজ্জা বোধ হত। লোকটির কাছ থেকে সাহায্য ও উপকার গ্রহণ করে'

তাকে পদে পদে অপমান ও অবজ্ঞা করতে পারা যে কত বড় নির্লজ্জতা, তা এই জড়চিত্ত লোকেরা অনুভব করতে পারে না। ধীরা এদের এই আচারের নামে অনাচার দেখে মনে মনে হাসত, একটু একটু ব্যথাও অনুভব করত, কিন্তু তাদের দরকারের সময় সাহায্য করতে কিছুমাত্র কৃপণতা করত না।

এইরূপে দুই একঘরে' বারংবার একই ঘরে সম্মিলিত হবার ও একত্রে কর্ম্ম করবার যে সুযোগ লাভ করছিল, সেই সুযোগে তারা দুজনে পরস্পরের মনেরও নিকটস্থ হচ্ছিল।

যে-দিন অনাথ চুম্বক লোহা চুরি করে' আবার ফিরিয়ে রেখে দিয়েছিল, সেই-দিন রাত্রে মতি বেনে দোকান বন্ধ করে' লণ্ঠন নিয়ে তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল ; পথে দেখা হল ধীরার সঙ্গে। ধীরা একটি বালকের রোগশয্যার পার্শ্বে বনবিহারী ডাক্তারের সঙ্গে সমস্ত সন্ধ্যাটি যাপন করে' এই মাত্র সেখান থেকে উঠে আসছে, তার মুখ বনবিহারীর সঙ্গলাভের মাধুর্য্যে ও আনন্দে ঝলমল করছে। মতি বেনের লণ্ঠনের আলো তার মুখের উপর পড়তেই দেবীপ্রতিমার অপরূপ শ্রীতে সে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মতি ধীরার এই আনন্দোজ্জ্বল মাধুর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তির দিকে মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এত রাত্রে মা-লক্ষ্মীর কোথায় শুভাগমন হয়েছিল ?

ধীরা হেসে বললে—যাদু মিস্ত্রির ছেলের বড় অসুখ ; যায়-যায় হয়েছিল ; এখন ডাক্তার-বাবু বললেন আর কোনো ভয় নেই।

মতি স্নিগ্ধ হাস্যে ধীরাকে অভিনন্দন করে' বললে—যেখানে ধন্বন্তরির সঙ্গে স্বয়ং লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয় সেখানে ভয় কি থাকতে পারে মা!

ধীরা লজ্জিত হয়ে এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এত রাত্রে এ-দিকে কোথায় চলেছ ?

মতি বেনে বল্‌লে—এই ছেলেটাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি মা। ছেলেটার অসুখ করেছে—কদিন থেকেই দেখ্‌ছি ওর শরীরটা ভালো নেই—ওকে বল্‌লুম বাড়ী গিয়ে শুয়ে থাক, কিন্তু কিছুতেই গেল না। ছেলেমানুষ, অসুখ করেছে, একলাটি যাবে, তাই ওকে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

ধীরা উৎকণ্ঠিতা হয়ে অনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আলো-আঁধারীতে তার মুখ ভালো করে' দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোর কী অসুখ করেছে রে অনাথ?

অনাথ মৃদুস্বরে বল্‌লে—আমার ত কিছুই অসুখ করে নি।

মতি বেনে করুণার হাসি হেসে বল্‌লে—আচ্ছা বোকা! নিজের অসুখ করেছে তাও বুঝ্‌তে পারিস নে।

ধীরা মতিকে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার চিনিবাস কেমন আছে কাকা?

শ্রীনিবাস মতি বেনের ছেলে। গাঁয়ে যখন কলেরা লেগেছিল, তখন চিনিবাসও আক্রান্ত হয়েছিল। ধীরার যত্নে ও বনবিহারীর চিকিৎসায় সে ভালো হয়েছে। মতি বললে—সে ভালো আছে মা। তাকে এইবার তোমার স্কুলে ভর্ত্তি করে' দেবো।

ধীরা হেসে বল্‌লে—আমার স্কুলে দেবে? সেখানে ত অনেক অজাতের ছেলে পড়ে, আমারও তো জাত নেই কাকা।

মতি লজ্জিত হয়ে বল্‌লে—চিনিবাসের প্রাণ রক্ষা করেছ তুমিই, তোমার দেওয়া প্রাণ নিয়ে যদি তার জাত না গিয়ে থাকে, তবে তোমার দেওয়া শিক্ষা নিয়েও তার জাত যাবে না।

ধীরা নিজের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছিল, সে হেসে বল্‌লে—এখন তবে আসি কাকা।

মতি আগ্রহভরে বল্‌লে—এসো মা, এসো।

মতি অনাথকে নিয়ে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে চলে' গেল।

যখন পথে ধীরা মতি বেনের সঙ্গে কথা বল্‌ছিল, তখন পরীর বাড়ীতে পরী গুঞ্জরী নদীর ধারে একটি সোফার উপর শুয়ে নদীর জলের উপর জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি দেখ্‌ছিল। তার সঙ্গে সেই-বাড়ীতে যে যুবকটি থাকে সে এসে পরীর সোফার ঠেসানের উপর হাত রেখে দাঁড়াল। পরী যেমন শুয়ে ছিল তেম্‌নিই শুয়ে রইল, যুবক যে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে টের পেয়েছে কি না তা ঠিক বোঝা গেল না। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যুবক স্নিগ্ধ স্বরে ডাক্‌লে—পান্না!

পান্না যেমন শুয়ে ছিল তেম্‌নিই শুয়ে রইল—নিস্পন্দ নীরব।

আবার একটুক্ষণ অপেক্ষা করে' যুবক ডাক্‌লে—পান্না! তুমি কি ঘুমিয়েছ?

পান্না তখনো কোনো সাড়া শব্দ কর্‌লে না।

যুবক আবার স্নেহপূর্ণ কাতর স্বরে ডাক্‌লে—পান্না! একটি কথা কও, আজ সমস্ত দিন তোমার মুখে হাসি দেখি নি। তুমি তো জানো পান্না, তোমার হাসি আমার প্রাণের আলো।

এবার পান্না ভাঙা কাঁসরের মতন কর্কশ স্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—আঃ! কি ক্যাচ ক্যাচ করো প্রণয়! সমস্ত দিন ঐ এক কথা বলে' বলে' জ্বালাতন করে' তুল্‌লে যে! যার হাতে একটা পয়সা নেই তার মুখে হাসি বেরুবে কেবল কি তোমার ঐ চাঁদবদন দেখে?

প্রণয় আহত হয়ে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—তোমায় ত বলেছি পান্না,

তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই, আমার প্রাণ মন ধন সম্পত্তি নিঃশেষে তোমায় দিয়ে চুকেছি, আমার কিছুই আর দিতে বাকি নেই।

পান্না প্রণয়ের দিকে মুখ না ফিরিয়েই ঝঙ্কার দিয়ে বলে' উঠ্‌ল—তোমার প্রাণ মন নিয়ে ধুয়ে জল খেলে তো আমার পেট ভর্‌বে না। ধন সম্পত্তি আমাকে কী দিয়েছ শুনি?

প্রণয় কাতর স্বরে বল্‌লে—নিজের দান নিজের মুখে ব্যক্ত করার হীনতা থেকে আমাকে অব্যাহতি দিতে তুমি পার্‌তে; কিন্তু যখন তুমি নিজে সব জেনেও আমাকে দিয়েই বলাতে চাও আমি কি দিয়েছি তখন হীনতা স্বীকার করে'ই আমি বল্‌ছি—এই বাড়ীর দাম এই পাড়া-গাঁয়েও অন্তত দশ হাজার টাকা হবে; এত আস্‌বাব আর সজ্জার দামও হাজার পাঁচেক টাকা হবে; তোমাকে গহনা দিয়েছি—তাও পাঁচ-ছ হাজারের কম নয়, আর মাসে পাঁচ-শ টাকা করে' মাইনে পাই, তাও তোমার হাতে এনে দি; আর এ-সব ছাড়া যা দিয়েছি তা জগতে দুর্লভ, তা অমূল্য।

পান্না আবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—ইস্‌ ভারি তো দিয়েছেন! হাজার বিশেক টাকা দিয়েছেন তো নেহাল করেছেন! ঝন্নুলাল মাড়োয়ারী আমাকে কল্‌কাতায় একখানা আস্‌বাবপত্রে সাজানো বাড়ী, মোটর গাড়ী লক্ষ টাকা নগদ, আর মাসে হাজার টাকা দিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিল। আমি তোমার নাকে-কাঁদুনি আর ঘ্যান্‌ঘ্যানানিতে ভুলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে চলে' এলাম। যার পুঁটি-মাছের প্রাণ, তার আবার বেশ্যা রাখ্‌বার সখ কেন? তার উচিত বিয়ে-থা করে' ঘরের মাগ নিয়ে কায়-ক্লেশে গেরস্থালি করা। আমি ত আর তোমার বিয়োলো মাগ নই যে পেটে না খেতে পেলেও তোমার চাঁদবদন দেখে কেদার্ত্ত হয়ে যাব। আমায় ছেড়ে দে প্রণয়, দিয়ে একটা তোর মতন ছিঁচ্‌কাঁদুনে ছুঁড়িকে

বিয়ে কর্‌গে যা। আর না হয় তো বেশ্যা রাখার মতন বেশ্যা রাখ্। তোর কাছে এই কষ্ট করেই যদি থাক্‌ব, তবে সোয়ামী মুখপোড়াকে ছেড়ে বেরিয়ে এলাম কেন, সে বেচারা তোর চেয়ে আর কি বেশী দোষ করেছিল ?

পান্নার এই সুভাষিতাবললী শুনে প্রণয় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তাকে নির্বাক্ দেখে পান্না আবার বল্‌লে—তুই ত ব্যাঙ্কের কেশিয়ার। তোর হাত দিয়ে রোজ দশ-বিশ লাখ টাকা যাওয়া আসা করে। অন্য লোক হলে এতদিনে তা থেকে লাখখানেক টাকা সরাতে পার্‌ত। পাঁচ-সাত লাখ সরিয়েও ধরা পড়ে নি এমন সেয়ানা লোকের কথাও তো শুনতে পাওয়া যায়।

প্রণয় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে বল্‌লে—আচ্ছা, তোমার হুকুম আমি তামিল কর্‌ব। আমি এখ্‌নি কল্‌কাতায় চল্‌লাম ; তোমার হুকুম প্রালন না করে' ফিরে আস্‌ব না।

প্রণয় যে কী কঠিন প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, তার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করে' পান্না যেমন মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিল তেমনি শুয়ে রইল। প্রণয় দীর্ঘনিশ্বাস চেপে স্নিগ্ধনেত্রে একবার পান্নার মুখের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে চলে' গেল।

খানিকক্ষণ চুপ করে' শুয়ে থেকে পান্না ডাক্‌লে—সুরো !

সুরো ঝি এসে তার সাম্‌নে দাঁড়াল। পান্না জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবু কোথায় ?

সুরো বল্‌লে—বাবু এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।

পান্না উঠে বসে' সুরোকে বল্‌লে—আমার চিঠি লেখ্‌বার চাম্‌ড়ার ব্যাগ্‌টা এনে দে, আর আলোটা সাম্‌নে এগিয়ে দে।

পান্না চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল।—

প্রাণের মদন,

অনেক কষ্টে ছিনে-জোঁকটাকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য ছাড়িয়েছি; প্রণয়টা কল্‌কাতায় গেছে, শীগ্‌গির ফের্‌বার সম্ভাবনা নেই। অতএব তুমি স্বাগত সুস্বাগত—অবিলম্বে চলে' আস্‌বে—তোমার পথ চেয়ে রইলাম।

তোমার সোহাগের পান্না।

পরদিন বিকালবেলা পান্না তার বাড়ীর বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে ছিল; সে দেখ্‌লে নদীর ধার দিয়ে একটি বলিষ্ঠ সুন্দর তরুণ যুবা আর একটি তন্বী সুন্দরী যুবতী পাশাপাশি বেড়াচ্ছে। অকারণ কৌতূহলে সে তার দূরবীনটা নিয়ে এসে চোখে লাগালে। সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল যুবার মুখে এক অপরূপ প্রভা, আর যুবতীর মুখে এক অনির্ব্বচনীয় দীপ্তি। যুবতীর মুখের ভাব দেখে পান্নার মনে হল সে যেন নিজের সৌভাগ্যের আনন্দে ডগমগ কর্‌ছে। তৎক্ষণাৎ পান্নার সমস্ত মন সেই তরুণীর উপর তীব্র হিংসায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। পান্না তীক্ষ্ণস্বরে ডাক্‌লে—সুরো।

সুরো এসে দাঁড়াতেই পান্না তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ঐ যে নদীর ধার দিয়ে একজন বেটাছেলে আর একজন মেয়েলোক আস্‌ছে, তুই ওদের চিনিস্?

সুরো বারাণ্ডার ধারে এগিয়ে গিয়ে তরুণ-তরুণীকে ঠাহর করে' দেখে বল্‌লে—ও যে ডাক্তার-বাবু আর ধীরা। ওরা সব খিরিস্তান মা।

পান্না ডাক্তার আর ধীরার দিক্ থেকে চোখ না ফিরিয়ে আর চোখ থেকে দূরবীন না নামিয়েই জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ডাক্তারের নাম কি? ধীরা কি ওর বৌ?

সুরো বল্‌লে—না মা, ঘেন্নার কথা কও কেন? অত বড় সোমত্ত ধাড়ী মেয়ে রাত-দিন ঐ ডাক্তারের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। ওর মা- বাপই বা কেমন তাও ত বুঝ্‌তে পারি নে।

পান্না আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ডাক্তারের নাম কি?

—বনবিহারী ডাক্তার। ওরও ঘেন্নার কথা কও কেন মা? লোকটা বেজন্মা। তা নিজের মুখে বল্‌তে ওর একটু লজ্জা নেই—বলে, আমার বাপ-মায়ের ঠিক নেই বলে' আমার কোনো পদবী নেই, শুধু নাম আছে। কল্‌কাতার কোন এক বড়লোক ওকে কুড়িয়ে-পেয়ে মানুষ করেছে' লেখাপড়া শিখিয়েছে।

——এখানে ওর বাড়ীতে কে থাকে?

——কেউ না মা। ঘেন্নার কথা আর কত কব—একটা বাগ্‌দী চাকর রেখেছে, তারই হাতের রান্না খায়। আমাদের মনে কর্‌তেই তো গা ঘিনঘিন কর্‌ছে।

পান্না চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে বল্‌লে—গণেশকে বল্‌গে ডাক্তারকে ডেকে আন্‌বে—আমার ভারি অসুখ কর্‌ছে। ছুটে গিয়ে বলুক আমার মূর্চ্ছা হয়েছে।

সুরো অবাক্ বিস্ময়ে একবার মুনিবের মুখের দিকে চেয়ে সেখান থেকে চলে' গেল, সে মুনিবের দূরবীন দিয়ে ডাক্তারকে দেখা আর তার পরিচয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অসুখ হওয়ার কার্য্য-কারণ-সম্পর্কটা ঠিক ধর্‌তে পার্‌ছিল না।

পান্না যখন দূরবীন করে' বনবিহারী আর ধীরাকে দেখ্ছিল, তখন বনবিহারী ধীরাকে বল্ছিল—আপনাকে একটা কথা অনেক দিন থেকে বল্ব বল্ব মনে কর্ছি, সাহস করে' বল্তে পার্ছি না। আপনি যদি অভয় দেন তো-বলি।

এই কথা শুনে ধীরার সুন্দর মুখখানি লজ্জারুণ হয়ে উঠ্ল, সে হেসে বল্লে—আমি অভয়ও দিতে পার্ব না. আপনার কিছু বল্তেও হবে না। আপনি আগে আমাকে আপনি বলাটা ছাড়ুন তো। আপনি আমাকে আপনি বলে' কথা বল্লে আমার মনে হয় আমি একটা ভয়ানক বড়লোক। আমাকে উঁচুতে তুলে রেখে কোনো কথা যদি বলেন, তবে সে-কথা আমার কানে পৌঁছবে কেন?

বনবিহারীর মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্ল, সরলতার দীপ্তি তার মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্ল, সে বল্লে—তোমার এই অনুরোধ আমিও তোমাকে জানাচ্ছি—তোমাকেও আমাকে তুমি বল্তে হবে।

ধীরা ফিক করে' হেসে লজ্জাভরা চকিত দৃষ্টি বনবিহারীর মুখের দিকে তুলে চট করে' বল্লে—তুমি।

তার পর ধীরা ঝরণা-ধারার মতন খিলখিল করে' হেসে উঠ্ল; বনবিহারীও হাসিতে মুখ বিকশিত করে' বল্লে—তবে আর আমার কোনো কথা বল্বার দরকার নেই।

এই কথা বলে' বনবিহারী ধীরার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিলে; ধীরা লজ্জিত স্মিতমুখে নিজের হাতখানি বনবিহারীর হাতের উপর তুলে দিলে।

বনবিহারী কৃতার্থ হয়ে বল্লে—আমাদের পাণিগ্রহণ হয়ে গেল। আমার জীবনের পরম পুরস্কার আমি প্রাপ্ত কর্লাম।

"বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখপানে,
উঠেছে ম্লাণ্ণ ঘোর মেঘের মাঝখানে!"

ধীরা সুখাবিষ্ট মুগ্ধ নেত্রে নীরবে একবার শুধু বনবিহারীর মুখের দিকে চাইলে, আর মনে মনে বল্‌লে—আমারও।

বনবিহারী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বল্‌লে—চলো, বাবাকে মাকে প্রণাম করিগে।

তারা দুজনে বাড়ীর দিকে চল্‌তে আরম্ভ করেছে, এমন সময় পান্নার চাকর গণেশ ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বনবিহারীকে বল্‌লে—ডাক্তার-বাবু, শীগ-গির আসুন, শীগ্‌গির আসুন, আমাদের গিন্নি-মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

বনবিহারী থম্‌কে দাঁড়িয়ে ধীরার মুখের দিকে চাইলে—এক দিকে তার স্বার্থের ডাক, আর এক দিকে তার ব্রতের ডাক,—দুইয়ের মাঝখানে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

ধীরা একবার বনবিহারীর দ্বিধান্বিত মুখের দিকে, আর একবার গণেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বনবিহারীকে বল্‌লে—তুমি দেখে এসো, আমি এগিয়ে যাই।

মিলনের প্রথম মুহূর্ত্তে ব্যাঘাত এসে বিচ্ছেদ ঘটানোতে ধীরার মুখ নিষ্প্রভ ম্লান হয়ে গেল। বনবিহারীর মুখও অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। সে ধীরাকে বল্‌লে—অজ্ঞান হয়েছে বল্‌ছে, কখন জ্ঞান হবে তার ঠিক নেই। তুমি বাড়ী যাও, আমি যত শীগ্‌গির পারি যাচ্ছি।

বনবিহারী আজ এই প্রথম পন্নার বাড়ীর ভিতরে পদার্পণ কর্‌লে। সে এই বাড়ীর সজ্জা ও ঐশ্বর্য্য দেখে চমৎকৃত হয়ে গেল; শহর থেকে সুদূরে এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে বিলাসের এমন বিপুল আয়োজন দেখ্‌বার আশা সে কখনো করেনি। সে আরো চমৎকৃত হল বাড়ীর অধিকারিণীকে

দেখে। একটি নিটোল মুক্তার মতন লাবণ্য-ঢলঢল যুবতী একখানি চওড়া সোফার উপর শুয়ে আছে, তার দেহলতা শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়েছে একজন দাসী তাকে বাতাস কর্‌ছে, আর একজন তার মুখে চোখে জলের ঝাপ্‌টা মার্‌ছে।

বনবিহারী রোগিণীর রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ মনকে সচেতন করে নিজের কর্ত্তব্যের দিকে ফিরিয়ে এনে দাসীদের বল্‌লে— ওঁর গায়ের জামাকাপড়গুলো খুলে আল্‌গা ক'রে দাও।

স্নুরো হাতের পাখা পাশের তেপায়ার উপর রেখে পান্নার কাপড় জামা খুলে আল্‌গা করে' দিতে লাগ্‌ল। স্নুরো ডাক্তারের চোখের সাম্‌নে পান্নায় শুভ্র বক্ষ অনাবৃত করে' দিলে। বনবিহারী তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বল্‌লে—কাপড়টা আল্‌গা করে' গায়ে দিয়ে রাখো।

পান্না চট করে' একবার চোখ ঈষৎ খুলে বনবিহারীর অবস্থা দেখে নিলে; তার অত্যন্ত হাসি পাচ্ছিল, সে সোফার ঠেসানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুল।

পান্নাকে মুখ ফিরিয়ে শুতে দেখে বনবিহারী স্নুরোকে বল্‌লে—কোনো ভয় নেই, জ্ঞান হচ্ছে। এঁর কি মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা হয়?

স্নুরো বল্‌লে—হ্যাঁ, প্রায়ই হয়।

স্নুরো যদিও পান্নার কাছে মাত্র এই মাস পাচ-ছয় চাক্‌রী কর্‌ছে, আর পান্নাকে এর আগে কখনো মূর্চ্ছা যেতে দেখে নি, তবু আজকের মূর্চ্ছা প্রকৃত নয় জেনেই সে বুদ্ধি করে' ঐ কথা বল্‌লে। স্নুরোর উত্তর শুনে পান্না তার উপর খুব খুশী হয়ে গেল।

বনবিহারী পান্নার সোফার পাশে একটা চেয়ারে বসে' পান্নার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে তার চুড়ি সরিয়ে পান্নার মণিবন্ধ টিপে

ধর্‌লে, দেখ্‌লে পান্নার নাড়ী দ্রুত বহমান হচ্ছে। তখন বনবিহারী পকেট থেকে ষ্টেথেস্কোপ বার করে' পান্নার বক্ষ পরীক্ষা কর্‌তে প্রবৃত্ত হল—দেখ্‌লে, পান্নার হৃদয় গুরু স্পন্দিত হচ্ছে।

বনবিহারী সুরোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এঁর কি হঠাৎ কোনো উদ্বেগের কারণ ঘটেছিল?

সুরো একটু ভেবে বল্‌লে—কাল বাবু কল্‌কাতায় চলে' গেছেন।

সুরো কি বল্‌তে কি বল্‌বে এই ভয়ে পান্নার আর মূর্চ্ছিত হয়ে থাকা চল্‌লো না; সে অ্যাঁ ওঁ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে চেতনা লাভ কর্‌তে লাগ্‌ল।

বনবিহারী সুরোকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবুর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া হয়েছিল?

সুরো বল্‌লে—তা তো ঠিক বল্‌তে পারি না।

পান্না ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরিয়ে ক্ষীণ টানা সুরে "আ—:, মা—:" বলে' ধীরে ধীরে ঈষৎ চক্ষু উন্মীলন করলে। তার পর যেন হঠাৎ একজন পরপুরুষকে নিজের কাছে বসে' থাক্‌তে দেখে তটস্থ হয়ে গায়ের কাপড়-চোপড় সাম্‌লে উঠে বস্‌তে গেল।

বনবিহারী বাধা দিয়ে বল্‌লে—আপনি ব্যস্ত হবেন না, উঠ্‌বেন না, আমি ডাক্তার।

কিন্নরী থিয়েটারের প্রসিদ্ধ দক্ষ অভিনেত্রী পান্না চোখে মুখে পরম বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে জনান্তিকে সুরোকে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমার গাময় জল কেন? ডাক্তারবাবু এসেছেন কেন?

সুরোও পরম বিস্ময়ের ভাণ করে' বল্‌লে—ওমা! তাও জানো না! তুমি যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে!

পান্না ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে—এ রকম আমার প্রায়ই হয়; বুক ধড়ফড় করে, আর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

বনবিহারী বল্‌লে—আপনার বুক পরীক্ষা করে' ত দেখ্‌লাম, আপনার হার্টের কোনো রকম দোষ নেই। আপনার এ স্নায়ুর পীড়া—মনের পীড়া। আপনাকে একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, এইটে কিছুদিন ধরে' খাবেন, তা হলেই ভালো হয়ে' যাবেন। আমাকে একটা কাগজ কলম দাও তো।

সুরো বনবিহারীর সাম্‌নে পান্নার চিঠি লেখ্‌বার মরক্কো-চাম্‌ড়ার ব্যাগটা এনে রাখ্‌লে।

বনবিহারী সেটা খুল্‌তেই তার ভিতর থেকে অত্যুৎকৃষ্ট এসেন্সের মৃদু সুরভি ভেসে উঠে সেখানকার বাতাসটুকু মদির করে' তুল্‌লে। বন-বিহারী পান্নার সোনার ঝরণা-কলম দিয়ে সুরভিত চিঠির কাগজে পান্নার বুক-ধড়ফড়ানির ঔষধের ব্যবস্থা লিখ্‌তে বস্‌ল। সে একবার অপাঙ্গে পান্নাকে দেখে নিয়ে সুরোর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি নাম লিখব?

সুরো এই কয়েক মাস মাত্র পান্নার কাছে চাক্‌রী কর্‌ছে, সে পান্নার কোনো পরিচয়ই জানে না; সে হয়ত দু'একবার প্রণয়ের মুখে পান্না আব্বান শুনে থাক্‌বে, কিন্তু সেটা বাবুর আদরের ডাক, না গিন্নির আসল নাম, তা সে ঠিক কর্‌তে পারেনি; তাই সে কি নাম বল্‌বে ভেবে ঠিক কর্‌তে না পেরে ইতস্ততঃ কর্‌ছিল। পান্না এই অবসরে একটু ভেবে নিয়ে লজ্জাকৌতুক-জড়িত ক্ষীণ-কণ্ঠে বল্‌লে—আমার নাম তৃষিতা।

এই নূতন নাম শুনে বনবিহারী আর-একবার অপাঙ্গে পান্নার দিকে চেয়ে নিয়ে ব্যবস্থা লিখ্‌তে লাগ্‌ল।

বনবিহারী যখন ব্যবস্থা লিখ্‌ছিল, পান্না তখন মুগ্ধ নেত্রে বনবিহারীর পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য যেন পান কর্‌ছিল।

রূপের ফাঁদে ডাঁড়ে পড়ে না পাক মরবে —পদ্মা ৩৪ পৃষ্ঠা

বনবিহারী প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন লিখে উঠে দাঁড়াল এবং পান্নার দিকে ফিরে বল্‌লে—খাওয়ার পর রোজ তিনবার করে' এ ওষুধটা মাসখানেক খাবেন। তার পর কেমন থাকেন আমাকে একটু খবর দেবেন।

পান্না এক চোখ বনবিহারীর দিকে রেখে, আর এক চোখ সুরোর দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে—ডাক্তার-বাবুকে ভিজিট এনে দে।

বনবিহারী এই কথা শুনে পান্নার দিকে চেয়ে বল্‌লে—আমি গাঁয়ের লোকের কাছে ভিজিট নিই না।

পান্না ধীরে ধীরে উঠে সোফায় হেলান দিয়ে ব'সে' বল্‌লে—আপনার মহত্ত্বের কথা অনেক শুনেছি। যারা অক্ষম তাদের কাছ থেকে পয়সা নেন না, এ খুব ভালোই করেন। কিন্তু ভগবানের দয়াতে আমি ত দিতে পারি, আমার কাছ থেকে নেবেন না কেন? আপনি উপকার বেচেন না জানি, উপকার করাই আপনার ব্রত। কিন্তু সেই ব্রত পালন কর্‌তে হলেও ত অর্থের প্রয়োজন।

সুরো একখানি কাজকরা রূপার রেকাবির উপর একটি গিনি রেখে রেকাবিখানি বনবিহারীর সাম্‌নে তেপায়ার উপর রাখ্‌লে।

তা দেখে বনবিহারী বল্‌লে—আমি গ্রামের বাইরেও এক ক্রোশের মধ্যে ধনীর কাছেও এক টাকার বেশী দক্ষিণা নিই না; তার চেয়ে বেশী দূরে যেতে হলে কেবল ধনীর কাছে দু'টাকা আর গাড়ী-ভাড়া নিই। আপনি যা দিচ্ছেন এ ত আমার আটটা ডাকের পারিশ্রমিক।

পান্না মুখ নীচু করে' মৃদুস্বরে বল্‌লে—আপনার দরিদ্রসেবার কাজে আমার সামান্য সাহায্য আপনি গ্রহণ কর্‌লে আমি সুখী হব।

পান্নার রূপে ও বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ না হলে বনবিহারী সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌ত যে পান্নার এই অজ্ঞান হওয়ার একটি দ্বিতীয় অর্থ আছে, এবং তাকে

এই কায়দাদুরস্ত ভাবে দক্ষিণা দেওয়াটা কেবল মাত্র দাসীর বুদ্ধিতে কুলো-বার কথা নয়, মুনিব ও দাসীতে আগে থাকতেই একটা ষড়যন্ত্র ঠিক হয়ে ছিল।

বনবিহারী হাসিমুখে গিনিখানি তুলে নিয়ে বল্‌লে—আপনার এই দানে অনেক গরীবের ঔষধপত্রের সংস্থান হবে।

বনবিহারী নমস্কার করে' গমনোদ্যত হল। পান্না তাকে বল্‌লে—আমার এমন মূর্চ্ছা প্রায়ই হয়। আপনাকে আমি প্রায়ই বিরক্ত কর্‌ব। তাতে আবার উনি বাড়ীতে নেই।

বনবিহারী ফিরে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—তা আপনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ কর্‌বেন না, আমাকে একটু খবর দিলেই আমি আস্‌ব।

পান্না বনবিহারীর কথা শুনে মনে মনে খুব খুশী হয়ে মাথা নীচু করে' হাতের নখ খুঁটতে খুঁটতে বল্‌লে—আমি মাসে মাসে আপনাকে দরিদ্র-সেবার জন্যে কিছু কিছু করে' দেবো, আপনি যদি রোজ একবার যখন আপনার খুশী আর ফুর্‌সৎ হবে এসে আমাকে দেখে যান।

বনবিহারী হেসে বল্‌লে—রোজ আস্‌তে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পরোপকারের নাম করে'ও এত টাকা আমি নিতে পার্‌ব না।

কিন্নরী থিয়েটারের দক্ষ অভিনেত্রী পান্না তার সুন্দর টানা চোখের কোণ দিয়ে মাদকতা-মাখানো কটাক্ষ হেনে, ঠোঁটের কোণে মৃদু কোমল হাসিটিকে মধুরতম আবেশে অভিষিক্ত করে' বল্‌লে—আপনার অনিচ্ছাতে আমি কিছু কর্‌ব না। দূর গ্রামে ডাকে গেলে আপনি যা নিয়ে থাকেন, আমার বাড়ীতে রোজ আস্‌তে হবে বলে' আপনাকে তাই দেবো—মাসে এক-শ টাকা আপনাকে নিতে হবে।

বনবিহারী হেসে বল্‌লে—দেনা-পাওনার দর-দাম মাস-কাবারে

করা যাবে। এখন আমি আসি—আমার একটু তাড়াতাড়ি দরকার আছে।

বনবিহারী আর অপেক্ষা না করে' চলে' গেল। পান্নার মনে হল এই তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরকার ধীরার কাছে যাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। ধীরার সৌভাগ্যের উপর হিংসায় পান্নার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। সে মনে মনে বলে' উঠ্‌ল—আচ্ছা রোসো।

*
* *

আজ অরণ্যষষ্ঠীর মেলা। রুদ্রা গ্রাম থেকে মাইলটাক দূরে গুঞ্জরী নদীর তীরে একটি বন আছে। সেই বনের মধ্যে এক বৃদ্ধ বৃহৎ বটগাছের তলায় ষষ্ঠীপূজা হয়। সেই উপলক্ষ্যে কাছাকাছি পাঁচ-সাত গ্রামের সকল মাতা পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সেই বনে ষষ্ঠীর পূজা দিতে ও আশীর্বাদ নিতে সমবেত হয়; যার যা ক্ষমতা ও যে যা জোগাড় কর্‌তে পারে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে সেই বনে আসে, এবং সকলের সংগৃহীত সামগ্রী একত্র করে' সকলের একসঙ্গে বনভোজনের আয়োজন হয়। সেই ভোজে ভাত ডাল বিবিধ তরকারি দই পায়েস মিষ্টান্ন আম জাম কাঁঠাল প্রভৃতির প্রচুর আয়োজন হয়। বড় বড় জোল কেটে সকল গ্রামের ব্রাহ্মণীরা মিলে রন্ধন করেন ও সকলকে পরিবেষণ করে' খাওয়ান। যে কেউ এক মুঠো চাল, কি একটা বেগুন, অথবা দু'গাছা লাউ-ডগা এনে সাধারণ তহবিলে জমা দেয়, তারই ভূরিভোজে অধিকার বর্ত্তে' যায়; যারা কিছু নাও দিতে পারে তারাও পাত পেড়ে বসে' পড়্‌লে প্রত্যাখ্যাত হয় না! এই উপলক্ষে এখানে একটি ছোটখাট মেলাও বসে' থাকে—তার মধ্যে ছেলেভুলানো জিনিসের

আর খাবারের দোকানই বেশী। নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই উৎসুক হয়ে এই মেলার দিনের প্রতীক্ষা করে' থাকে। এই অরণ্যষষ্ঠী পূজার দিনটি গ্রামবাসীদের বৈচিত্র্যহীন জীবনের একটি দিনকে বৈচিত্র্য দান করে' উৎসবান্বিত করে' তোলে।

এই মেলার আগের দিন্ সন্ধ্যাবেলায় বনবিহারী নদীর ধারে ধীরার পাশে বসে' ছিল; সে ধীরার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললে—আমি বনবিহারী, কাল বিশেষ করে' আমার উৎসব; আমি কাল তোমাকে ছেড়ে একবারও নড়্ব না—তাতে আমার সমস্ত পসার মাটি হয়ে গেলেও না।

ধীরা পরিপূর্ণ সুখে বনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীরবে একটু কেবল হাস্লে। অল্পক্ষণ পরে বললে—কিশোরটা আবার জ্বর করে' বসেছে। আহা বেচারা যেতে পাবে না।

কিশোর ধীরার ভাই, নীরার চেয়েও ছোট।

পরদিন প্রভাত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রামে গ্রামে ষষ্ঠীর অরণ্যে যাবার ধুম পড়ে' গেল; গ্রামে রইল কেবল পীড়িত আর তাদের আগ্লাতে অতি-বৃদ্ধেরা। ধীরার ভাই কিশোর বেচারা জ্বরে পড়াতে সে মেলায় যেতে পেলে না, এবং তাকে আগ্লাতে বাড়ীতে রইলেন জলধর-বাবু আর তাঁর স্ত্রী।

মেলায় গিয়ে ধীরাকে দখল করে' নিয়েছিল বনবিহারী, আর নীরাকে দখল করেছিল প্রচুর। মতি বেনের দোকান আজ মেলাতে খুলেছে, অনাথ বেচারা সেই দোকানে আবদ্ধ হয়ে আছে, সে মনে মনে ছট্ফট কর্লেও একবারও নীরার কাছে যেতে পারে নি। আজ দোকানে খুব ভিড়, বিক্রিও হচ্ছে হরদম। আজ এই সুযোগে অনাথ দোকানের অনেক পয়সা চুরি করেছে—সেই পয়সা দিয়ে নীরাকে কিছু উপহার কিনে দেবে।

যখন অনাথের মনে হল সে নীরাকে উপহার দেবার মতন যথেষ্ট পয়সা সঞ্চয় করেছে, তখন সে এক ফাঁকে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল; এবং অন্যলোকের মণিহারী দোকান থেকে উপহার-সামগ্রী কিন্‌তে গেল। সে যে নীরাকে কি উপহার দেবে, কি তাঁর মনঃপূত হবে, কিসে সে প্রচুরকে পরাজিত করতে পারবে এই দুর্ভাবনাতে কিছু কেনাই তার দুষ্কর হয়ে উঠ্‌ল।—অনেক দোকান ঘুরে, অনেক জিনিস ঘেঁটে, অনেক ইতস্ততঃ করার পর সে কিন্‌লে রঙীন ফুল-আঁকা কৌটায় পাওডার, মন্দিরাকৃতি শিশিতে পমেটম, আর এক বাক্‌স টিনের হাঁস নৌকা—সেগুলিকে চুম্বক-শলাকা দিয়ে চালনা করা যায়, আর কিন্‌লে নীরা ভালোবাসে বলে' এক পয়সার ভাজা চীনেবাদাম।

অনাথ খুঁজে খুঁজে গিয়ে নীরাকে যখন আবিষ্কার করলে তখন দেখ্‌লে একটা গাছের তলায় একটা উঁচু শিকড়ের উপর নীরা আর প্রচুর পাশাপাশি বসে' আছে। প্রচুরকে দেখেই অনাথের মুখ শুকিলে গেল, সে দূরে থম্‌কে দাঁড়িয়ে কাছে যাবে, কি না-যাবে ইতস্ততঃ করতে লাগ্‌ল। প্রচুরের সাম্‌নে যেতে না হলেই সে সুখী হত, কিন্তু এখন সে ফিরেই বা যায় কোথায়, আর চুরি-করা পয়সা দিয়ে কেনা এই-সব বিলাস-সামগ্রী রাখেই বা কোথায়?

তাকে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে প্রচুর বলে উঠ্‌ল—কি হে অনাথ! এস এস, দেখি, তোমার হাতে ও-সব কি!

অনাথের ম্লানমুখ লজ্জায় সঙ্কোচে মলিনতর হয়ে উঠ্‌ল, সে অনিচ্ছা-মন্থর পদে অগ্রসর হয়ে এসে কাছে দাঁড়াতেই প্রচুর অনাথের হাতের জিনিসগুলি নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলে। অনাথ কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—নীরার জন্যে এনেছি।

প্রচুর অট্টহাস্যে বনস্থলী প্রতিধ্বনিত করে' বলে' উঠ্‌ল—আমার জন্যে যে আনো নি তা আমি জানি। ভয় নেই তোমার, আমি নিয়ে নেব না, কি এনেছ দেখে নীরাকেই দিয়ে দেবো।

প্রচুর আবার হেসে উঠ্‌লো, সঙ্গে সঙ্গে নীরাও।

অনাথ মুখ কাচুমাচু করে' নীরার দিকে কাতর দৃষ্টিতে একবার চেয়ে সমস্ত জিনিসগুলি প্রচুরের হাতে তুলে দিলে। প্রচুর এক একটি মোড়ক খুল্‌তে লাগ্‌ল আর বলতে লাগ্‌ল—বাঃ! তোফা! চারটি চালের গুঁড়ো, একটুখানি ভালুকের চর্ব্বি, ছারপোকা আর ছুঁচোর গন্ধ দিয়ে ভুরভুর—ভুটো টিনের খেলনা, আর উপাদেয় দুর্লভ খাদ্য চীনে বাদাম ভাজা! খাসা উপহার এনেছ! এই নাও নীরা, তোমার উপহার।

প্রচুর অনাথের উপহারগুলি নীরার কোলের উপর রেখে দিলে।

প্রচুর ব্যঙ্গ করে' যেমন যেমন বলছিল তেমন তেমন পাওডারের কৌটা আর পমেটমের শিশিতে আঙুল বুলিয়ে অনাথকে দেখিয়ে দিচ্ছিল কৌটার উপরে লেখা আছে রাইস পাওডার, আর শিশির উপর লেখা আছে বেয়ারস্‌ গ্রীজ। এই দেখে অনাথ বেচারার ত চক্ষু স্থির, তার লজ্জার আর অন্ত রইল না, তার মনে হল—সে নির্ব্বোধের মতন এমন তুচ্ছ জিনিস কেমন করে' উপহার দিতে নিয়ে এল! প্রচুর তাকে যে ব্যঙ্গ করলে তা তার ন্যায্য প্রাপ্য; সে মূঢ়, তাই আগে সে লেখাগুলো পড়ে' দেখেনি। আর চীনের বাদাম যে কত তুচ্ছ সুলভ সামগ্রী তাও সে আগে ভেবে দেখে নি। বেচারা অনাথ জান্‌ত না যে চালের গুঁড়ো দিয়েই উৎকৃষ্ট পাওডার তৈরী হয়, আর ভালুকের চর্ব্বিই উৎকৃষ্ট পমেটমের উপাদান; আর চীনের বাদাম তুচ্ছ সুলভ হলেও সে-জিনিসটি তার সংগ্রহ করতে আগ্রহ হয়েছিল নীরা খেতে ভালোবাসে বলে'ই; কিন্তু এখন প্রচুরের উপহাসে

উপহারের তুচ্ছতাই তার দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হয়ে আর-সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে' ফেললে।

প্রচুর নীরার কোলে উপহারগুলি রাখ্‌তেই অনাথের লজ্জা যেন নীরার লজ্জা হয়ে উঠ্‌ল; সে নিজের লজ্জা ঢাক্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়্‌ল, অনাথের যে কি অবস্থা সেদিকে মনোযোগ দেবার তার আর অবসর রইল না। একটা কেলে কুকুর, একটা সাঁওতালের উলঙ্গ মেয়ে, আর একটা গরু তাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল; নীরা পাওডারের কৌটাটা খুলে সমস্ত পাওডারখানি কেলে কুকুরের গায়ের উপর ছড়িয়ে দিলে; পমেটমের শিশিটা সাঁওতালের মেয়েটাকে দিয়ে দিলে, আর চীনে-বাদামগুলো আঁচল ঝেড়ে ঢেলে দিলে গরুটার মুখের কাছে, আর টিনের হাঁস নৌকাগুলো ভাসিয়ে দিলে গুঞ্জরী নদীর জলে। অনাথের প্রতি এই নিষ্ঠুর আচরণে প্রচুরের কাছে সে নিজের লজ্জা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে মনে করে' নীরা খিল্‌খিল করে' হেসে উঠ্‌ল; প্রচুর হাস্য করতে লাগ্‌ল; আর অনাথ লজ্জা-কাতর মুখ ও ছল্‌ছল চোখ নত করে' অপমানের আঘাতে মর্ম্মাহত হয়ে সেখান থেকে ধীরে ধীরে চলে' গেল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল—আমার চুরি করাই সার হল!

অরণ্যের মেলায় যখন মিলন ও বিরহের বিচিত্র লীলা প্রকটিত হচ্ছিল, তখন রুদ্রা গ্রামে পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীর মতন পান্না ছট্‌ফট করছিল; সে এই গ্রামে এসে অবধি একদিনের তরেও বাড়ী থেকে বেরোয় নি, কারো সঙ্গে তার পরিচয়ও হয় নি, পাছে গ্রামের লোকে ঘুণাক্ষরেও তার আসল পরিচয় পেয়ে তাকে ঘৃণা করে এই আশঙ্কায় অভিমানিনী পান্না সকলকে সযত্নে পরিহার করে'ই এসেছে; তার পর বনবিহারী ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দিন থেকে সে ত রোগপীড়িতা হয়েই আছে; কাজেই সে

ইচ্ছা সত্বেও আজ মেলায় যেতে পারে নি। অধিকন্তু প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে'ই সে বনবিহারীর প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন চিত্তে পথ চেয়ে বসে' থাকে; বনবিহারীর যখন অবকাশ হয় তখন সে তার দৈনিক হাজরী পূরিয়ে দিতে আসে—কোনো দিন বা প্রভাতে, কোনো দিন বা মধ্যাহ্নে, কোনো দিন বা অপরাহ্ণে, আর কোনো দিন বা সায়াহ্নে তার দেখা পাওয়া যায়। আজ মেলার দিন প্রভাতে উঠেই পান্নার মনে হয়েছিল আজ বনবিহারীও হয়ত মেলায় যাবে, এবং মেলায় যাওয়ার আগে পান্নাকে দেখে যাওয়ার কাজ চুকিয়ে যাবে। সে বারাণ্ডায় বসে' বসে' দেখ্‌ছিল কত লোক কাতারে কাতারে মেলায় চলেছে, কিন্তু তার মধ্যে বনবিহারীর আগমনের আভাস কোথাও সে খুঁজে পাচ্ছিল না। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় প্রভাত অতিবাহিত হয়ে মধ্যাহ্ন হল, তখনো বনবিহারীর দেখা নেই; মধ্যাহ্ন-সূর্য্য গড়িয়ে অপরাহ্ণে উপনীত হল, তখনো বনবিহারীর কোনো সন্ধান নেই। তখন পান্নার মনে হতে লাগ্‌ল হয়ত বনবিহারী মেলায় গিয়ে ধীরার পাশে বসে' ধীরার হাত হাতে তুলে নিয়ে সেই সেদিনকার মতন আজও হাস্‌ছে গল্প করছে। ধীরার উপর হিংসায় পান্নার মন বিষিয়ে উঠ্‌ল; সে আর চুপ করে' থাকৃতে পারলে না; গণেশকে ডেকে বললে —গণেশ, তুই ছুটে যা, ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বলগে আমার বড্ড অসুখ করছে, বুক ধড়ফড় করছে, গা ঝিমঝিম করছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে, নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে—যা, যা, আমি মরে' যাবার আগে ডাক্তার-বাবুকে এসে একবার দেখ্‌তে বল্। ডাক্তার-বাবুকে যদি বাড়ীতে দেখ্‌তে না পাস তা হলে একবার জলধর-বাবুদের বাড়ীতেও খোঁজ করিস—খোঁজ করে' জেনে আসিস ডাক্তার-বাবু কোথায় গেছে।

গণেশ ছুটল ডাক্তারের সন্ধানে। ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়ে সে দেখ্‌লে

সদর দরজায় তালা দেওয়া, বাড়ীতে কেউ নেই। গণেশ সেখান থেকে ছুটে গেল জলধর-বাবুর বাড়ী। সে হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ধীরার মাকে সামনে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তার-বাবু কি এখানে আছেন?

গণেশের ব্যস্ত ত্রস্ত ভাব দেখে ধীরার মা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন রে? ডাক্তারকে কি জন্যে দরকার?

গণেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—পরীর বাড়ীর মা-ঠাকৃরুণের ভারি ব্যামো, যায় যায় অবস্থা—বুক ধড়্ফড় কর্‌ছে, দম বন্ধ হয়ে আস্‌ছে, নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে!

ধীরার মা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—বনবিহারী ত এখানে নেই, সে যে মেলায় গেছে। তুই ছুটে মেলায় গিয়ে খবর দিগে।

গণেশ চলে' যেতে যেতে বলে' গেল—এক কোশ পথ গিয়ে ডাক্তার এনে দেখাবার আর কি সময় আছে মা। দেখি আর-কাউকে পাই কি না।

পান্না বনবিহারীর আগমনের প্রতীক্ষায় আগে থাক্‌তেই শয্যা আশ্রয় করে' বরফ-জলের মধ্যে হাত পা ডুবিয়ে বসে' ছিল; নাড়ী ছেড়ে হিমাঙ্গ হয়ে যাবার অভিনয় সম্পূর্ণ কর্‌বার জন্যে সে রোজ ষ্টেশনে লোক পাঠিয়ে ট্রেনের সোডাওয়ালার কাছ থেকে খানিকটা করে' বরফ কিনে এনে রাখে। গণেশের সাড়া পেতেই পান্না তাড়াতাড়ি বরফ-জলের গাম্‌লাটা খাটের তলায় ঠেলে দিলে, আর টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত পা মুছে বিছানায় এলিয়ে শুয়ে পড়্‌ল, আর বুকের কাপড়টা সরিয়ে বুকের অনেকখানি অনাবৃত করে' দিলে।

গণেশের সঙ্গে ঘরে এসে ঢুক্‌ল নবীন সাঁতরা—বনবিহারীর কম্পাউণ্ডার।

নবীন পান্নার মুখ আর বুকের দিকে তাকিয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,

রোগীকে চিকিৎসা করার কথা ভুলেই গেল। গণেশ একখানা চেয়ার এনে খাটের কাছে 'রাখ্‌তেই নবীনের চেতনা ফিরে এল ; সে চেয়ারে ব'সে সন্তর্পণে পান্নার হাত নিজের হাতে তুলে নিলে।

নবীনের স্পর্শ অনুভব করে'ই পান্না বুঝ্‌তে পার্‌লে এ স্পর্শ বনবিহারীর নয়।

নবীন পান্নার হাত তুলে ধরে'ই বলে' উঠ্‌ল—ইস! এ যে একেবারে হিম বরফ!

সে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পায়ে হাত দিলে, আবার বিস্ময় প্রকাশ করে' বল্‌লে—ইস! পাও যে ঠাণ্ডা! আবার অল্প অল্প ঘামও হচ্ছে—হাত-পাগুলো ভিজে ভিজে!

নবীনের কণ্ঠস্বর শুনেই পান্না চম্‌কে উঠ্‌ল—এ ত বনবিহারী নয়! সে চক্ষু ঈষৎ ফাঁক করে' দীর্ঘ পক্ষ্মজালের ভিতর দিয়ে দেখ্‌লে একটা ভয়ানক কৃশ লোক কালো জঙ্গলের মতন এক মুখ দাড়ি ও ভুরুর ভিতর থেকে ড্যাবা ড্যাবা দুটো চোখ পাকিয়ে তাকে যেন গিলতে চাইছে। গণেশের ও এই অনধিকারে আগত অজানা লোকটার উপর রাগে পান্নার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে' উঠ্‌ল—বনবিহারীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হল, সেই কি নিজে না এসে এই হতভাগা দুষ্‌মন-চেহারা লোকটাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে ব্যঙ্গ কর্‌ছে'! পান্নার ইচ্ছা কর্‌তে লাগ্‌ল ঐ কেলে দেড়ে লোকটার হাত থেকে হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় বসিয়ে তাকে ঘর থেকে বিদায় করে' দেয় ; কিন্তু সে যে তখন মর-মর তাই তাকে নিতান্ত ধৈর্য্য ধারণ করে' আত্মসংযম কর্‌তে হল। এই কুশ্রী লোকটার লালসা-লোল দৃষ্টির সম্মুখে তার বক্ষ যে অনাবৃত হয়ে আছে এর দুঃখ ও লজ্জা পান্নাকে মরণাধিক পীড়া দিতে লাগ্‌ল।

নবীন সাঁতরা পান্নার নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করে' তার জানা শোনা যত কিছু উত্তেজক ঔষধ ব্যবস্থা কর্‌লে—ব্র্যাণ্ডি, মকরধ্বজ, মৃগনাভি ও কর্পূর এবং ষ্ট্রীক্‌নিয়া।

কম্পাউণ্ডার চলে' যেতেই পান্না লাফিয়ে বিছানার উপর উঠে বসে' চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল—সুরো, সুরো, সুরো।

সুরো তার চীৎকার শুনে ছুটে এসে দাঁড়াল। সুরোকে দেখেই পান্না চীৎকার করে' উঠ্‌ল—আমি অসুখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে' থাকি বলে'ই কি তোরা যাকে-তাকে ডেকে আন্‌বি?

পান্না আরো বল্‌তে যাচ্ছিল—তোরা আমায় একটু ঢেকে ঢুকেও দিতে পারিস নে, যে-সে এসে আমার খোলা গা দেখে যায়।" কিন্তু বল্‌তে গিয়েও সে থেমে গেল, পাছে এই কথা শুনে তার দাসীরা অতি সাবধান হয়ে বনবিহারীর সাম্‌নেও তাকে ঢেকে ঢুকে রাখে।

সুরো বল্‌লে—তোমার বড্ড অসুখ করেছিল, তাইতে বড় ডাক্তার না পেয়ে গণেশ এই ডাক্তারকে ডেকে এনেছিল।

পান্না বলে' উঠ্‌ল—আমি যদি মরে'ও যাই তা হলেও বড় ডাক্তারকে ছাড়া আর কাউকে ডাকবি নে, বুঝ্‌লি? জনে জনে সবাইকে বুঝিয়ে বলে' দিবি—বিশেষ করে' ঐ গণ্‌শা আহাম্মকটাকে।

গণেশ বেচারা একবার ছুটে ডাক্তার ডাক্‌তে গিয়েছিল; ফিরে এসেই আবার ওষুধ আন্‌তে ছুটেছিল; ওষুধ নিয়ে বেচারা ছুটোছুটি এসে দেখে অবাক্ হয়ে গেল, তাদের মা-ঠাক্‌রুণ দিব্যি সুস্থ হয়ে বিছানার উপর উঠে বসেছে এবং এক থালা কচুরী শিঙাড়া পান্‌তুয়া রসগোল্লা নিশ্চিন্ত মনে নিঃশেষ কর্‌ছে! সে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে যে ওষুধগুলো নিয়ে এসেছে সেগুলোর গতি যে কি হবে তা সে ভেবে ঠিক করতে না পেরে

ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে গিয়ে কর্ত্রীর সাম্‌নে রেখে দিলে। ওষুধ রেখে সে ফির্‌তে না ফির্‌তে বেচারার পিঠে ওষুধের পুরিয়া কৌটা শিশি আছ্‌ড়ে এসে পড়্‌ল। বেচারা একবার ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে কর্ত্রীর দিকে তাকিয়েই সেখান থেকে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন কর্‌লে।

ধীরার ছোট ভাই কিশোরের জ্বর হওয়াতে সে মেলায় যেতে না পেয়ে বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়ে ছিল। সে যখন শুন্‌লে পরীর বাড়ীর পরীর খুব কঠিন অসুখ, তার জন্যে ডাক্তার খুঁজ্‌তে এসেছে, তখন তার কোমল মন অপরিচিতা ও অদেখা রোগিণীর প্রতি মমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে হল যে সে যদি মেলায় ডাক্তার ডাক্‌তে যায় তা হলে এই উপলক্ষ্যে তার মেলাটাও দেখা হয়ে যায়। গণেশ তাদের বাড়ী থেকে চলে' যেতেই কিশোর তার মাকে বল্‌লে—মা, আজ ত আমি অনেকটা ভালো আছি, আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তার-দাদাকে ডেকে আন্‌ব?

কিশোরের মা বল্‌লেন—না, না, তোর অসুখ করেছে, তুই কোথায় যাবি?

কিশোর কাতর স্বরে বল্‌লে—পরীর যে মা আরো বেশী অসুখ!

কিশোরের মা বল্‌লেন—তা ওরা ত বড়লোক, ওদের অনেক লোক জন আছে, তারাই কেউ ডাক্তারকে ডাক্‌তে যাবে, তোর ব্যস্ত হতে হবে না।

কিশোর চুপ করে' শুয়ে রইল, কিন্তু তার মনের ব্যস্ততা ঘুচ্‌ল না। অল্পক্ষণ পরে তার মা একবার যেই অন্য ঘরে গেছেন, অমনি সেই অবসরে কিশোর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে' মেলার দিকে ছুট্‌তে আরম্ভ কর্‌ল।

শীঘ্র গিয়ে ডাক্তারকে খবর দিতে হবে, এবং মেলা ভেঙে যাবার

আগে মেলায় গিয়ে পৌঁছে মেলাটা একবার দেখেও নিতে হবে, এই দুই উদ্দেশ্যের তাড়নায় কিশোর প্রাণপণ বেগে ছুট্‌তে লাগ্‌ল। খানিক দূরে ছুটে গিয়েই সে দুর্ব্বলতায় ও ক্লান্তিতে এবং রৌদ্রের তাপে অবসন্ন হয়ে মাটিতে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে' গেল। একটুক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে' থেকে কিশোর আবার মনের জোরে ঠেলে উঠ্‌ল এবং কম্পিত চরণে টল্‌তে টল্‌তে ছোট্‌বার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। কিছু দূর গিয়ে আবার সে আছাড় খেয়ে পড়ে' গেল; তার গা ঝিম্‌ঝিম কর্‌ছিল, চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছিল। অল্পক্ষণ অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে' থেকে সে আবার জোর করে' উঠে মূর্চ্ছাপন্ন দেহকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিছু দূর যেতে না যেতে সে একেবারে অচেতন হয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

মেলা থেকে যে-সব লোক বাড়ী ফির্‌ছিল তাদের এক দল এসে দেখ্‌লে পথের ধারে একটি বালক মাটিতে পড়ে' রয়েছে, তার সর্ব্বাঙ্গে ধূলো, যেখানে জামা কাপড় নেই সেখানকার ধূলো গায়ের ঘামে ভিজে কাদা হয়ে উঠেছে। তারা তাড়াতাড়ি এসে দেখ্‌লে ছেলেটি একেবারে মারা যায় নি, বুক ধুক্‌ধুক কর্‌ছে, অল্প অল্প নিশ্বাস পড়্‌ছে; সে ঘুমিয়েও পড়ে নি, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে। তারা ধরাধরি করে' কিশোরকে চিত করে' শুইয়ে দিলে, এবং তার মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে ষষ্টীর পাখা দিয়ে বাতাস দিতে লাগ্‌ল। তাদের মধ্যে একজন কিশোরকে চিন্‌তে পার্‌লে—এ যে রুদ্রা গাঁয়ের জলধর মুখুজ্জের ছেলে। এর দিদিদের মেলায় দেখে এলাম। চলো, তাদের কাছে একে নিয়ে যাই।

তাদের মধ্যে একজন কিশোরকে বুকে তুলে নিয়ে মেলার দিকে ফিরে চল্‌ল; তারা প্রায়ই সবাই পর্য্যায়ক্রমে কোল বদল করে' কিশোরকে নিয়ে মেলায় পৌঁছল।

মেলার মধ্যে যেতে না যেতে বহু লোক এসে কিশোরকে ঘিরে ধর্‌লে। অনাথ বেচারা জনারণ্যের মধ্যে নিঃসঙ্গ একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিল; সে কিশোরকে দেখেই ছুট্‌ল ধীরা ও নীরাকে খবর দিতে। দৌড়ে গিয়ে সে দেখ্‌লে ধীরা আর বনবিহারী এক গাছের ছায়ায় বসে' হাসিমুখে গল্প কর্‌ছে; সে দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল—ধীরা-দিদি, ধীরা-দিদি, কিশোর এসে পথে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তাকে সবাই ধরাধরি করে' নিয়ে আস্‌ছে।

ধীরা চকিত হয়ে ভয়ব্যাকুল মুখ অনাথের দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে কিশোর? কোথায় রে?

অনাথ আঙুল দিয়ে একটা দিক্ নির্দ্দেশ করে' বল্‌ল—ঐ ঐদিকে

এই বলে'ই অনাথ নীরার সন্ধানে ছুট্‌ল। বনবিহারী ও ধীরা কিশোরকে দেখ্‌তে দৌড়োলো।

অনাথ গিয়ে দেখ্‌লে সেই আগের গাছের গুঁড়ির উঁচু শিকড়টার উপর পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বসে নীরা আর প্রচুর তেলে-ভাজা পাঁপর খাচ্ছে। তাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেই অনাথের মন ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠ্‌ল, এবং সে যে কিশোরের খবর দিয়ে এদের মধ্যে এখনই বিচ্ছেদ ঘটাতে পার্‌বে এই সম্ভাবনার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। অনাথ দূর থেকেই চীৎকার করে' উঠ্‌ল—নীরা, নীরা, কিশোর এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, ধীরা-দিদি তোমাকে ডাক্‌ছে, ছুটে এস।

এই অকস্মাৎ দুঃসংবাদ শ্রবণে নীরা চম্‌কে একেবারে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল; তার হাত থেকে পাঁপর-ভাজাটা ভেঙে মাটিতে পড়ে' টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল, আর সেই কেলে কুকুরটা টুপ করে' উঠে এসে হাঁউ হাঁউ করে' সেগুলো কুড়িয়ে খেতে লাগ্‌ল। নীরা ম্লান মুখে একবার অনাথের দিকে

তাকিয়ে পরক্ষণেই মুখ বিরক্তিতে ভরে' তুল্‌লে, এবং প্রচুরের দিকে ফিরে বল্‌লে—কিশোর ছোঁড়াটা এসে সব ফুর্ত্তি একদম মাটি করে' দিলে! চলো দেখিগে গুণধর ভাই আমার কি কাণ্ড করেছেন।

নীরা প্রচুরের সঙ্গে অনাথের নির্দ্দিষ্ট দিকে ছুটে চলে' গেল; অনাথের দিকে তারা আর দৃক্‌পাত কর্‌লে না। অনাথ বেচারা প্রচুরের সঙ্গে নীরার যে বিচ্ছেদ ঘটবার কল্পনায় আনন্দ অনুভব করেছিল, সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত না হওয়াতে সে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হয়ে নীরাদের পিছনে পিছনে ছুটে চল্‌ল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে মেলায় বহু লোকের জনতার মধ্যে লোকের সর্দ্দিগর্‌মি ভেদবমি হতে পারে মনে করে' বনবিহারী মোটামুটি কতকগুলি ওষুধ তার জামার চার পকেটে ভরে' নিয়ে এসেছিল। তার চিকিৎসায় ও ধীরার শুশ্রূষায় কিশোরের চেতনা ফিরে এল। সে জ্ঞান লাভ করে'ই বনবিহারীকে দেখে বলে' উঠ্‌ল—ডাক্তার-দাদা, পরীর বড় অসুখ, সে মর-মর; তার চাকর গণেশ তোমাকে খুঁজ্‌তে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। তাই আমি ছুটে এলাম তোমাকে খবর দিতে। তুমি এক্ষুণি যাও—আমি ত এখন ভালো হয়েছি।

পান্না মর-মর শুনে বনবিহারীর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল; সে বল্‌লে—আচ্ছা আমি যাচ্ছি, তুমি চুপ করে' শুয়ে থাকো।

কিশোরকে বাড়ীতে নিয়ে যাবার কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে ভেবে বনবিহারী তার পাশে তাকাতেই দেখ্‌লে অনাথ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে অনাথকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে—অনাথ ভাই, একখানা গরুর গাড়ী দেখ্‌তে পারো? কিশোরকে নিয়ে, কিশোরের দিদিরা যাবেন।

ধীরার ভাই মুর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে শুনে মতি বেনে দোকান ফেলে কিশোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বনবিহারীর কথা শুনে সে বল্‌লে —আমার দোকানের জিনিস নিয়ে গাড়ী এসেছিল, আমি সেই গাড়ী এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। গাড়ী এদের পৌঁছে দিয়ে এসে আমার মাল নিয়ে যাবে। গাড়ীর ছৈ নেই, বাখারি আর কম্বল দিয়ে আমি ছৈ বানিয়ে দেবো।

গাড়ীর ব্যবস্থা এত সহজে হয়ে যাওয়াতে বনবিহারী নিশ্চিন্ত হয়ে ধীরাকে বল্‌লে—তোমরা তবে এস, আমি এগিয়ে চল্‌লাম।

পত্নীর ডাক শুনেই বনবিহারী যে-রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং তার কাছে যাবার জন্যে যে-রকম ব্যস্ততা প্রকাশ কর্‌লে তা দেখে ধীরার মনে ঈষৎ সন্দেহ হল এ হয়ত কেবল রোগী দেখ্‌বার কর্ত্তব্যের আগ্রহ নয়। সেই আগ্রহের হেতু যে কি তা স্পষ্ট করে' ভাব্‌তেও ধীরার সাহস হল না, অস্পষ্ট আভাসেই তার মন আতঙ্কে চম্‌কে উঠ্‌ল।

ধীরার কাছে মেলায় মোহ আর রইল না—একে ভাইয়ের পীড়া, তায় বনবিহারী অনুপস্থিত, তার উপর একটা অস্পষ্ট আশঙ্কা তাকে ক্রমশঃই আচ্ছন্ন করে' ধর্‌ছিল।

ধীরা বাড়ী ফের্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে অনাথকে বল্‌লে—ভাই অনাথ, মতি-কাকাকে বল্‌গে গাড়ীখানা শীগ্‌গির পাঠিয়ে দেবে।

অনাথ বল্‌লে—আমি এই দেখে আস্‌ছি, গাড়ীর ছৈ তৈরী হচ্ছে।

ধীরা বল্‌লে—বেলা ত পড়ে' গেছে, রোদ্দুর আর নেই, ছৈ না হলেও চল্‌বে।

মতি বেনে ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে বল্‌লে—খোলা গাড়ীতে তোমাকে কেমন করে' পাঠাব মা? ছৈ এই হয়ে গেল বলে'।

রূপের ফাঁদ

অনেক বিলম্বে গাড়ী এল। গরুর গাড়ী ঢিকতে ঢিকতে যখন রুদ্রা গ্রামে প্রবেশ করলে তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পরীর বাড়ীর কাছে গাড়ী আস্‌তেই ধীরা মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল; তার মনে হতে লাগ্‌ল বনবিহারী হয়ত এখনো এই বাড়ীতে পরীর পাশে পরীর শয্যার উপর বসে' আছে; পরী—সে না জানি কেমন, সে না জানি কি কুহক জানে!

গাড়ী একটু এগিয়ে যেতেই সে দেখ্‌লে পরীর বাড়ীর উপরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছে অনিন্দ্য সুন্দরী লাবণ্যময়ী এক তরুণী, সে হাসিভরা মুখে সিগারেট টান্‌ছে।

এই রমণীই যে পরী সে-বিষয়ে ধীরার আর কোনো সন্দেহ রইল না; তার যে কোনো অসুখ করে নি, সে-সম্বন্ধেও কোনো সংশয় থাকৃল না; তার মুখে যে আনন্দ-দীপ্তি খেলা করছে, তা যে পরম লাভের পরিতৃপ্তির আভাস তাও সে বুঝ্‌তে পার্‌লে। ধীরার মন বনবিহারীর উপর সন্দেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, সে আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে কেঁদে ফেল্‌লে, এবং কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কিশোরকে বল্‌তে লাগ্‌ল—কিশোর, তুই কেন এলি ভাই, কেন এমন সর্ব্বনাশ ঘটালি?

কিশোর ও নীরা মনে করলে কিশোর মেলায় এসে অসুখ বাড়িয়ে তুল্‌লে বলে'ই ধীরার এই ব্যাকুলতা।

ধীরাদের গাড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে হেঁটে চলেছিল অনাথ; সে ধীরাকে কাঁদতে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে—ভয় কি দিদি, কিশোর শীগ্‌গির ভালো হয়ে যাবে।

অনাথের মমতার স্পর্শে ধীরার চোখের জল হু হু করে' ছুটে বেরুতে লাগ্‌ল।

* * *

পান্না বারাণ্ডায় সোফার উপর বসে' ছিল। সে দেখ্‌তে পেলে বনবিহারী ছুটতে ছুটতে তার বাড়ীর দিকে আস্‌ছে। তার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে' উঠ্‌ল—সে ত বনবিহারীকে খবর দেয় নি, সে নিশ্চয় লোকের মুখে তার অসুখের খবর পেয়ে তাকে দেখ্‌তে ছুটে আস্‌ছে। পান্না ভাব্‌তে লাগ্‌ল বনবিহারীকে কে খবর দিলে—গণেশ কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল, অথবা গণেশ ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাই দেখে ও শুনে মেলাযাত্রী কোনো লোক ডাক্তারকে গিয়ে খবর দিয়েছে, কিংবা বনবিহারীর কম্পাউণ্ডার নবীন সাঁতরা তার প্রভুকে খবর দিয়েছে? খবর যেই দিক, বনবিহারী যে ব্যস্ত হয়ে ছুটে তাকে দেখ্‌তে আস্‌ছে এই আশাতীত ঘটনায় আনন্দিত পান্নাকে এমন উৎফুল্ল করে' তুল্‌লে যে সে অসুখের ভাণ করে' পড়ে থাক্‌তে সাহস কর্‌লে না; সে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল তার হৃদয়ের এ বিপুল আনন্দ কিন্নরী থিয়েটারের সেরা অভিনেত্রীও গোপন করে' রাখ্‌তে পার্‌বে না; বনবিহারীর সঙ্গে একটু কথা বলার আনন্দ লাভের প্রলোভনও তার প্রবল হয়ে উঠ্‌ল। সে যেমন বসে' ছিল তেমনি বসে' রইল।

বনবিহারী তার আগমনের সংবাদ দেবার আগেই সুরো এসে তাকে একেবারে পান্নার কাছে নিয়ে গেল। বনবিহারী যখন হাঁপাতে হাঁপাতে পান্নার কাছে এসে দাঁড়াল, তখন পান্না মধুর কোমল হাসিতে তার সুন্দর মুখখানি উদ্ভাসিত করে' বনবিহারীকে অভ্যর্থনা কর্‌লে—আসুন ডাক্তারবাবু, বসুন, বসুন; বড্ড হাঁপাচ্ছেন।

বনবিহারী চারিদিক্ তাকিয়ে কোথাও বস্‌বার কোনো আসন না দেখে দাঁড়িয়ে থেকেই বল্‌লে—আপনার খুব অসুখ শুনে তাড়াতাড়ি মেলা থেকে ছুটে আস্‌ছি কিনা।

পান্না সোফার এক ধারে একটু সরে' গিয়ে বনবিহারীকে চোখের ইঙ্গিতে সোফার শূন্যস্থান দেখিয়ে আবার বল্‌লে—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন।

বনবিহারী পান্নার পাশে গিয়ে একটু সঙ্কুচিত হয়ে বস্‌ল।

পান্না স্মিত মুখ নত করে' চকিত কটাক্ষ বনবিহারীর শ্রমলোহিত মুখের উপর হেনে বল্‌লে—আপনি আমাকে এত ভালবাসেন যে এক কোশ পথ ছুটে এসেছেন!

পান্নার মুখে এই ভালোবাসা শব্দটা, বনবিহারীর কানে গিয়ে বেসুরা বাজ্‌ল; তার মনে হল উত্তরে বলে—এর মধ্যে ভালবাসার কোনো কথা নেই, কেবল মাত্র কর্ত্তব্যের ডাকে সে ছুটে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল এ-কথা বল্‌লে হয়ত অত্যন্ত বিশ্রী রূঢ় শোনাবে, যদি পান্না বিশেষ কিছু না ভেবে অসাবধানে ঐ কথাটা বলে' থাকে, তা হলে সে ঐ কথার কদর্থ করলে পীড়িতা পান্না মনে ক্লেশ অনুভব করবে। তাই সে ভালবাসা কথাটা বেওজরে শুনে থাকৃল, কিন্তু শব্দটা তার কানের মধ্যে ও মনের মধ্যে সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করতে লাগ্‌ল। বনবিহারী যে পান্নার কথার প্রতিবাদ কর্‌তে পার্‌লে না তার কারণ সে নিজের কাছে পীড়িতার ক্লেশের সম্ভাবনা বলে' উপস্থিত করলেও তার আসল কারণ হয়েছিল পান্না একে রমণী, তায় সুন্দরী, তদুপরি সে যুবতী। বনবিহারী এই কারণটি স্পষ্ট বুঝ্‌তে না পার্‌লেও তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে সুষুপ্ত অবস্থায় এই হেতুটি বর্ত্তমান ছিল। বনবিহারী পান্নার ভালবাসার কথা যেন শুন্‌তেই পায় নি এম্নি ভাব করে' জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কেমন আছেন?

পান্না আবার মধুমাখা মাদক হাসির মোহ ছড়িয়ে বল্লে—

ভালো আছি, আপনার কম্পাউণ্ডার যে ঔষধ দিয়েছিল তাই একবার খেয়েই ভালো হয়ে গেছি। তিনি আপনাকে খবর দিয়েছিলেন বুঝি?

বনবিহারী বল্‌লে—না। এখানে জলধর-বাবু ব'লে এক ভদ্রলোক আছেন তাঁর নাম শুনে থাকবেন বোধ হয়; তাঁরই ছেলে কিশোর ছুটে মেলায় গিয়ে আমাকে খবর দিয়েছে। আহা বেচারা কদিন থেকে জরে ভুগ্‌ছে, সে মেলায় যেতে পার নি; আপনার চাকর আমাকে খুঁজতে তাদের বাড়ীতে গিয়েছিল, তার মুখে পরীর খুব বেশী অসুখ শুনে সে আমাকে খবর দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বনবিহারী হেসে বল্‌তে লাগ্‌ল—এই ছুতো করে' একবার মেলায় যাবার ইচ্ছাটাও তার প্রবল হয়েছিল বোধ হয়। সে রদ্দুরে ছুটে গিয়ে সর্দ্দিগরমি হয়ে মেলার কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তার জ্ঞান হলে তাকে বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করে' দিয়ে আপনাকে দেখতে ছুটে এলাম।

বালক কিশোরের উপর মমতায় পান্নার নারীহৃদয় স্নেহার্দ্র হয়ে উঠ্‌ছিল, কিন্তু বনবিহারীর মুখে যখন সে শুন্‌লে যে কিশোর কেবল মাত্র পরীর জন্যেই ছুটে মেলায় যায় নি, তার নিজেরও আগ্রহ ছিল, তখন পান্নার করুণা অনেকখানি হ্রাস হয়ে গেল; বালক যে তার অসুখের খবর দিতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল এই কথাটা তার মনের মধ্যে আর প্রধান হয়ে রইল না, বনবিহারী যে তাকে দেখ্‌তে ছুটে এসেছে এই কথাটাই প্রধান হয়ে উঠ্‌ল; তাই সে বনবিহারীর কথার উত্তরে কেবল মাত্র বল্‌লে—আপনি আমাকে এত ভালবাসেন!

আবার ভালবাসার কথা! বনবিহারীর মনে সন্দেহ উঁকি মার্‌তে লাগ্‌ল—হয়ত বা সে সত্যই পান্নাকে ভালবাসে, নইলে সে পান্নাকে

দেখ্‌তে আসবার জন্যে এত ব্যস্ত ও ব্যাকুল হয় কেন? হয়ত সে ঠিক ভালোবাসে না, পান্নাই তাকে ভালোবাসে, পান্নার মনের টান তাকে তার কাছে টেনে টেনে আনে। বনবিহারীর মনে হল ধীরাকে সে ত পান্নার চেয়েও ঢের বেশী ভালবাসে, কিন্তু ধীরা ত একদিনও তাকে এমন করে' বলে নি—তুমি আমায় ভালোবাসো, আমি তোমায় ভালবাসি, সে নিজের হৃদয়ের গোপন বিপুল ভালোবাসা কতদিন ব্যক্ত কর্‌তে গেছে, কিন্তু ধীরা তাকে বল্‌তে দেয় নি, অন্য কথা পেড়ে সে-কথা চাপা দিয়েছে। বনবিহারীর মন সংশয়ে দ্বিধায় দোটানায় পড়ে' বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌ল। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে—আজ তবে আসি।

পান্না তার তনুলতা সোফার গায়ে এলিয়ে দিয়ে বল্‌লে—খুব বেশী কি কাজ আছে? আপনার সঙ্গে চিরকালই কি ডাক্তার আর রোগীর সম্পর্কই থেকে যাবে? বন্ধুত্ব কি আত্মীয়তা আপনি স্বীকার করবেন না?

পান্নার প্রগল্‌ভতায় বনবিহারী লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল; সে অপ্রস্তুত ভাবে বল্‌লে—জলধর-বাবুর ছেলের অসুখ, তাকে আর-একবার দেখে আসি।

এ কথার পর পান্না আর ডাক্তারকে বিলম্ব কর্‌তে বল্‌তে পার্‌লে না; তার জন্যে কিশোরের পীড়া বৃদ্ধি হয়েছে এই ভেবে তার মনে করুণারও সঞ্চার হল। সে বল্‌লে—কাল সকালেই এসে আমাকে খবর দিয়ে যাবেন ছেলেটি কেমন থাকে!

বনবিহারী পান্নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরাদের বাড়ী যেতে যেতে ভাব্‌তে লাগ্‌ল কেবল পান্নারই কথা—পান্না কী সুন্দরী! তার

হাসিটি কী মধুর! তার চাহনীতে মাদকতার।কী আবেশ! সে কি আমাকে ভালবেসেছে? যদি সে আমাকে ভালবেসে থাকে তা হলে তার কাছে যাওয়া আমার উচিত নয়। কিন্তু সে পীড়িত— তাকে না দেখ্‌লেই বা কেমন করে' চল্‌বে? রোজ তাকে দেখ্‌তে যাব এই সর্ত্তে তার চাকরী স্বীকার করেছি। এখন যাওয়া বন্ধ করিই বা কেমন করে'? ওর স্বামী ফিরে এলে ওকে দেখ্‌বার শোন্‌বার একজন লোক কাছে থাক্‌বে, তখন আমি এত ঘন ঘন না-গেলেও চল্‌বে। মেয়েটির সব সুন্দর—তার রূপ সুন্দর, হাসি সুন্দর, ব্যবহার সুন্দর, বাক্য সুন্দর, দৃষ্টি সুন্দর, তার নাম সুন্দর—তৃষিতা—এ কী মধুর মাদক নাম! তৃষিতা কি সত্যই তার নাম, না নামের বেনামিতে হৃদয়ের আত্মনিবেদন? সে কি সত্যই আমাকে ভালবাসে, না আমি তার রূপের দৃষ্টির বাক্যের ব্যবহারের ধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে আমারই রঙীন কল্পনা তার মনের মধ্যে আরোপ কর্‌ছি? দূর হোক ছাই, তার কথা আর ভাব্‌ব না; সে রোগী আমি ডাক্তার, এর বেশী আর কিছু নয়।

বনবিহারী কিশোরের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দেখ্‌লে কিশোর জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বক্‌ছে তার দু'পাশে বসে' আছেন তার মা আর ধীরা। বনবিহারী কিশোরের নাড়ী দেখ্‌বে বলে' তার শয্যার এক প্রান্তে বস্‌তেই ধীরা সেখান থেকে উঠে বাইরে চলে' গেল। বনবিহারী লক্ষ্য কর্‌লে ধীরার মুখ বিষণ্ণ ও গম্ভীর, সে একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখে থম্‌থম কর্‌ছে। বনবিহারী মনে কর্‌লে তার ভাইয়ের অসুখ বৃদ্ধিই এর কারণ। কিন্তু তখনই তার মনে হল পান্নার কথা—সে নিজে পীড়িতা হয়েও কি-রকম হাসিমুখে তার সঙ্গে আলাপ করে, নিজের দুঃখ দিয়ে অপরকে যে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়, এই অসাধারণ

বোধ ও সংযম তার আছে। তুলনায় আজ পান্নার কাছে ধীরার হার হয়ে গেল।

বনবিহারী কিশোরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে' দিয়ে চলে' যেতে যেতে চারিদিকে ধীরাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে গেল; কিন্তু কোথাও তাকে দেখ্‌তে পেলে না। আবার বনবিহারীর মনে ধীরার সঙ্গে পান্নার তুলনা জেগে উঠ্‌ল—পান্না তাকে ছেড়ে দিতে চায় না, কথায় কথায় কাছে জড়িয়ে রাখ্‌তে চায়, আর ধীরা তাকে পরিহার করে, এড়িয়ে চলে। সে ঘরে ঢুক্‌তেই ধীরা যে আজ উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং তাকে আর দেখ্‌তেই পাওয়া গেল না, এই অভব্যতা ধীরা দেখাতে পার্‌লে বনবিহারী তার কাছে অত্যন্ত সুলভ হয়েছে বলেই। সে দিন-কতক দুর্লভ হয়ে ধীরাকে দেখিয়ে দেবে যে তারও কিছু মূল্য আছে, এবং সেই মূল্য যাচাই হয়ে যাবে পান্নার কাছে।

ধীরা ঘরের ভিতর থেকে টের পেলে বনবিহারী বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে' গেল। অন্য দিন যাবার সময় বনবিহারী ধীরাকে খুঁজে দেখা করে তবে যায়; আজ তাহার ব্যবহারের ব্যতিক্রম দেখে ধীরার সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ল, আর তার দুই চোখ দিয়ে হু হু করে' জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভাইয়ের অসুখ বৃদ্ধিতে ধীরার মন রুদ্ধমুখ হয়েই ছিল, বনবিহারীকে হারাবার আশঙ্কা সেই অবরুদ্ধ রোদনকে প্রমুক্ত করে' দিলে।

মেলার পরদিন প্রভাতে নীরা গুঞ্জরী নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। অনাথ জানত এই সময় নীরা স্নান করতে যায়; সেও নদীর ধারে গিয়ে একটা দাঁতন ভেঙ্গে নিয়ে ক্রমাগত দাঁত ঘষ্‌ছিল, নীরাকে যতক্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাই তার পরম লাভ।

তারা দেখ্‌তে পেলে দূরে নদীতে একখানি ছোট সুন্দর সাদা রঙের ষ্টিম্‌-লাঞ্চ্‌ আস্‌ছে। এ নদীর ইতিহাসে ষ্টিম্‌-লাঞ্চের শুভাগমনের সংবাদ আর কখনও লিখিত হয় নি। ঘাটের লোক সকলেরই দৃষ্টি এই অপূর্ব্ব বস্তুটির প্রতি আকৃষ্ট হল। রাজহংসের মতন লীলাভঙ্গাভিরাম চঞ্চল গতিতে ষ্টিম্‌-লাঞ্চ্‌ ঘাটের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। ষ্টিম্‌-লাঞ্চ্‌ নিকটে এলে নীরা দেখ্‌লে ষ্টিম্‌-লাঞ্চের গায়ে বাংলা অক্ষরে তার নাম লেখা রয়েছে জলতরঙ্গ। ঘাটে সমবেত মেয়েদের মধ্যে নীরাই কেবল লেখাপড়া জানে; সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল —বা রে! ষ্টিমার-খানার নাম জলতরঙ্গ! কি সুন্দর মানানসই নামটি রেখেছে!

সকলকে চমৎকৃত করে' ষ্টিম্‌-লাঞ্চ্‌ পরীর বাড়ীর নীচে তীর থেকে অল্প দূরে থেমে নোঙর করলে।

নীরার তখন স্নান হয়ে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে শুক্‌নো জামা কাপড় পর্‌লে এবং ভিজে কাপড়খানি নিংড়ে হাতে নিয়ে নিকট থেকে ষ্টিম্‌-লাঞ্চ্‌ দেখ্‌বে বলে' পরীর বাড়ীর ঘাটের দিকে ছুটল। অনাথও অমনি দাঁতনটা টেনে জলে ফেলে দিয়ে দু আঁজলা জল তুলে মুখ ধুয়ে নিয়ে নীরার অনুসরণ করলে।

নীরা আনন্দ ও কৌতূহলে তার টানাটানা চোখ দুটি বিস্ফারিত করে' ষ্টিম্‌-লাঞ্চ্‌ দেখ্‌ছিল। সে দেখ্‌লে লাঞ্চের ঘরের ভিতর থেকে বাইরে

বেরিয়ে দাঁড়াল একটি তরুণ গৌরবর্ণ সুশ্রী বাবু—সে বাস্তবিকই বাবু—কালো জলের ঢেউয়ের মত তার মাথার চুল, তার সোনার চশ্‌মার ফ্রেম্‌টা তার গায়ের সোনার রঙে মিশে গিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে—মনে হচ্ছে যেন কাঁচ দুখানা তাঁর চোখের সাম্‌নে শূন্যে বিলম্বিত হয়ে রয়েছে, তার গায়ে মাখমের রঙের গরদের পাঞ্জাবী, তার পরণে কোঁচানো কাঁচি ধুতি, কোঁচার ফুলটি লুটিয়ে পড়েছে কালো হীরার আয়নার মতন চক্‌চকে পেটেন্ট্‌ লেদারের পাম্প্‌শুর উপর; তার পায়ে দুধের সরের রঙের রেশমী মোজা, তার গায়ের রঙের সঙ্গে একেবারে মিলিয়ে আছে; তার বাঁ হাতে সোনার পাতের রাখীতে সোনার হাতঘড়ি বাঁধা—সোনার রাখিও তার গায়ের রঙে ডুব দিয়েছে; তার ডান হাতের অনামিকা আঙুলে একটা আংটিতে একটা বড় হীরা জ্বল্‌জ্বল কর্‌ছে।

নীরা দেখ্‌লে সে যেমন উৎসুক কৌতুহলে বাবুটিকে দেখ্‌ছে, বাবুটিও তেমনি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে। বাবুটি তার দিক্‌ থেকে চোখ না ফিরিয়েই কাকে কি বল্‌লে। ক্ষণকাল পরেই একজন খান্‌সামা কামরার ভিতর থেকে বেরিয়ে বাবুর হাতে একটা বড় দূরবীন দিলে—সেটা হাতীর দাঁতে তৈরী। নীরা বুঝতে পার্‌লে এই দূরবীন দিয়ে সেই বাবু তাকে ভালো করে দেখ্‌বে। এতে তার একটু লজ্জা বোধ হল, অনেকখানি গর্ব্বও অনুভব কর্‌লে; সুন্দর দূরবীনটা দেখার আগ্রহ, এমন ধনী সুপুরুষের দর্শনীয় হওয়ার গৌরব, এবং সমস্ত ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বার কৌতূহল তার সামান্য লজ্জাকে একেবারে চেপে রেখে দিলে।

নীরা দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—একখানা ছোট সাদা-রং-করা ডিঙি

নৌকা ষ্টিমারের পিছনে বাঁধা ছিল, তার গায়ে তার নাম লেখা আছে কেলিহংস; সেইখানা ষ্টিমারের খালাসীরা খুলে নিয়ে ষ্টিমারের পাশে এনে ভিড়ালে; চক্‌চকে পিত্তলে বাঁধানো একটা সিঁড়ি দিয়ে বাবুটি সেই নৌকায় নাম্‌ল, আর তার সঙ্গে নাম্‌ল একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে সেই খান্‌সামা—তার পরণে ধব্‌ধবে ধোয়া চাপকান, মাথায় জরীর ঝালর দেওয়া পাগ্‌ড়ী, তাতে সোনার তক্‌মায় বাবুর নাম লেখা—শ্রীমদন-মোহন বড়াল।

মদন এসে যখন ডাঙায় নাম্‌ল তখন সেখানকার সমস্ত বাতাস একটি মৃদুসুরভিতে ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল; সেই সুগন্ধের নেশায় নীরার মনঃপ্রাণ একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মদন এক-রকম নীরার গা ঘেঁষে তার দিকে কুৎসিত কটাক্ষ হেনে মুচ্‌কি হেসে পরীর বাড়ীর ভিতরে চলে গেল। নীরার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়েই মদন তার খান্‌সামাকে বল্‌লে—ও রে মধু, ঐ ছুঁড়ীটাকে একবার দেখ দেখি।

এই দেখার যে কি মানে তা মধু বেশ জান্‌ত, কারণ এমন দেখা সে অনেকবার তার মনিবের হুকুমে দেখেছে। সে ব্যাগটা বাড়ীতে রেখেই বেরিয়ে এল। দেখ্‌লে সেই মেয়েটি তার চেয়ে বড় আর-একটি মেয়ের সঙ্গে চলে' যাচ্ছে, আর সে মেয়েটির কাছে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল সে সেইখানে তখনো দাঁড়িয়ে সেই গম্যমানা তরুণীর দিকে লুব্ধ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মধু অনাথের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে—বাবু, পেন্নাম হই।

হঠাৎ সম্ভাষণে চম্‌কে উঠে অনাথ ফিরে দেখ্‌লে মদন-বাবুর খান্‌সামা মাথা হেঁট করে' যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে তাকে নমস্কার কর্‌ছে। এত-

বড় বাবুর খান্‌সামা যে তাকে নমস্কার কর্‌ছে এই সৌভাগ্যের গর্ব্বে অনাথের হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ল, অমনি তার মনে হল এ সৌভাগ্য নীরা যদি দেখ্‌ত, প্রচুরা যদি দেখ্‌ত! অনাথ তাড়াতাড়ি হাসিমুখে মধুকে প্রতিনমস্কার কর্‌লে।

মধু বিনয়গদ্গদ বচনে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমরা আপনারা?

অনাথ কৃতার্থমন্য ভাবে হেসে বল্‌লে—আমরা ব্রাহ্মণ। আমার নাম শ্রীঅনাথনাথ চক্রবর্ত্তী।

মধু পরম গদ্গদ ভাবে বল্‌লে—ঐ যে দুগ্‌গা-ঠাক্‌রুণের মতন মেয়েটি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, উনি বুঝি আপনার বোন?

অনাথ মাথা নেড়ে বল্‌লে—না। আমার ভাই বোন মা বাপ কেউ নেই।

মধু কণ্ঠস্বরে চেষ্টাকৃত দুঃখের ভাণ প্রকাশ করে বল্‌লে—আহা!

কিন্তু অনাথের অনাথ অবস্থার জন্য মধুর দুঃখ এক ঐ আহাতেই শেষ হয়ে গেল; সে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ওনারা বুঝি আপনার পড়শী?

অনাথ অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌লে—হ্যাঁ।

মধু অনাথকে কিছুতেই বেশী কথা বলাতে পার্‌ছিল না বলে' মনে মনে তার উপর চটে' উঠ্‌ছিল; সে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ওনারা? ওনারাও ত বেরাম্ভন?

অনাথ বল্‌লে—হ্যাঁ, ওর বাপের নাম জলধর মুখুজ্জে। কিন্তু তিনি জাতটাত মানেন না, পৈতে ফেলে দিয়েছেন, সকলের ছোঁয়া খান।

মধুর হিঁদুয়ানী যেন ভয়ানক আঘাত পেয়েছে এমনি ভাব করে' সে

বলে' উঠ্‌ল—আরে রাম রাম! একেবারে মেলেচ্ছ তা হলে! বেরাম্ভ না খিরিষ্টান?

অনাথ বল্‌লে—না না ওরা ব্রাহ্মও নয়, খৃষ্টানও নয়! অমন ভালো লোক আমাদের গাঁয়ে আর কেউ নেই; যেমন কর্ত্তা গিন্নি, তেমনি মেয়েরা, ছোট্ট ছেলেটি পর্য্যন্ত চমৎকার ভালো।

মধু জিজ্ঞাসা করলে—তা ওনার ঐ একটি মেয়ে ত দেখ্‌লাম, আর কটি মেয়ে?

অনাথ বল্‌লে—আর একটি, তিনি নীরার চেয়ে বড়।

মধুর সজাগ কান অনাথের কথার মাঝখান থেকে কাজের কথাটি খুঁটে নিলে, এবং সেই সূত্র ধরে' সে বল্‌লে—ওনার নাম বুঝি নীরা? আর ওঁর দিদির নাম হীরা?

অনাথ হেসে ফেল্‌লে—বল্‌লে—না, না, হীরা নয়,—তাঁর নাম ধীরা তিনি বড় ভালো, তাঁকে সকল লোকেই ভালোবাসে।

মধু আবার জিজ্ঞাসা করলে—ওঁরা বুঝি খুব বড়লোক?

অনাথ বল্‌লে—না, খুব বড়লোক নয়, মোটামুটি গেরস্ত। কিন্তু গাঁয়ের ভালোর জন্য ওঁরা সবাই মিলে খুব চেষ্টা করেন, টাকা দিয়ে, গতরে খেটে.........

অনাথকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মধু বল্‌লে—বাঃ, এমন ভালো লোক! একদিন গিয়ে তাঁর ছিচরণ দর্শন করে' আস্‌ব—তাঁর বাড়ীটা কোন্ দিকে?

অনাথ নদীর উল্টোদিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লে—এই পথ ধরে' সোজা গিয়ে ডান দিকে বেঁক্‌লেই তাঁদের বাড়ী দেখা যায়—তাঁদের বাড়ী চিনে নিতে কষ্ট হবে না, অমন সুন্দর সাজানো বাড়ী এ গাঁয়ে কারো নেই

—চারিদিকে ফুলের বাগান, বাড়ীখানি তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। ওঁদের সব ভালো।

মধু অনাথের কণ্ঠস্বরে আবেগের পরিচয় পেয়ে হেসে বল্‌লে—আপনি ওদেরকে খুব ভালবাসেন দেখ্‌ছি—বিশেষ করে' ঐ ছোট ঠাকরুণটিকে—কেমন কিনা?

অনাথের মুখ আনন্দের লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠ্‌ল; সে যে নীরাকে ভালবাসে এ-কথা একজন অপরিচিত ব্যক্তিও যদি অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝে থাকৃতে পারে, তা হলে তার ভালোবাসার সংবাদ নীরারও অগোচর নেই, নীরার বাড়ীর লোকেরও অগোচর নেই—এ যে দুর্ব্বিসহ আনন্দ, অপরিসীম লজ্জা!

মধু অনাথকে নির্ব্বাক থাকৃতে দেখে ও তার মুখে আনন্দ ও লজ্জার খেলা দেখে হেসে মনে মনে বল্‌লে—রও ছোঁড়া, তোমার আশায় শীগ্‌গিরই খাট্টা গুল্‌ছি।

তার পর মধু প্রকাশ্যে বল্‌লে—এখন আসি দাদাঠাকুর। এখন ত আপনাদের গাঁয়ে থাকৃব, হামেশাই দেখা হবে, এ-গাঁয়ে এসে আপনার সঙ্গেই ত প্রথম আলাপ হল।

অনাথ তার আনন্দ ও লজ্জা সম্বরণ করে' কিছু বল্‌তে পার্‌বার মতন অবস্থা ফিরে পাবার আগেই মধু চলে' গেল। মধু চলে' গেলে তার হুঁস হল, এই লোকটার কাছ থেকে পরীর বাড়ীর রহস্য খানিকটা উদ্‌ঘাটন করে' নেওয়া যেতে পার্‌ত, এবং সেই সংবাদ দিয়ে নীরাকে খুশী করাও যেতে পার্‌ত। তার মনটা নিজের অসতর্কতায় ও তৎপরতার অভাবে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে হায় হায় কর্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে এই বলে' সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলে—লোকটার সঙ্গে আলাপ যখন হয়ে

রইল, তখন এইবার ওর দেখা পেলেই এই খবরটা জেনে নিতে হবে, এবং এইবার সে প্রচুরের উপর টেক্কা দিতে পারবে।

অনাথ মধুর পুনর্নিগমনের আশায় স্নানাহার ভুলে ফানুস-ঢাকা দীপ্ত আলোর পাশে পতঙ্গের মতন পরীর বাড়ীর চারিদিকে ঘুরঘুর করতে লাগল।

মদনকে দেখে পান্না বিশেষ খুশী হল না। পান্না তখন বনবিহারীকে আয়ত্ত করবার উদ্‌যোগে কায়মনপ্রাণ নিয়োজিত করেছিল, সেই সাধনার অন্তরায় রূপে মদনকে উপস্থিত হতে দেখে পান্না একটু অসন্তুষ্টই হল। তার মুখের ভাব দেখেই ধড়িবাজ মদন বুঝে নিলে যে সে পান্নার কাছে স্বাগত নয়, সে না এলেই পান্না খুশী হত। এর কারণ ঠিক বুঝতে না পেরে মদন পান্নাকে জিজ্ঞাসা করলে—প্রণয় ফিরে এসেছে নাকি?

পান্না গম্ভীর ভাবে কেবল বললে—না।

মদন হেসে বললে—তা হলে বুঝি আর কোনো নতুন শীকার জুটিয়েছ?

পান্না এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে ভ্রূকুটি করলে।

মদন তা দেখে হেসে বললে—ভয় নেই, আমি তোমার সুখের পথের কাঁটা হয়ে থাকব না। যেখানে ফুর্ত্তি নেই সেখানে মদন বড়াল এক দণ্ডও তিষ্ঠতে পারে না। আমি ত আর প্রণয়ের মতন পাগল নই, যে, তুমি বলে'ই তোমাকে আঁকড়ে ধরে' থাকব। আমাদের সখের প্রাণ গড়ের

মাঠ, আমরা রসের প্রজাপতি, টাট্‌কা ফুলের মধু খেয়ে রঙীন পাখা মেলে উড়ে বেড়াই। আমাদের পণ হচ্ছে—

"যাবই আমি যাবই ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই,
তোমায় যদি না পাই তবু
আর কারে ত পাবই!"

রবিঠাকুরের কথাটা একটু বদ্‌লে আমার মনের বাসনা ব্যক্ত কর্‌তে পারি—

"ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়—
সান্ত্বনার্থে হয় ত পাব চারজনায়!"

এবং তুমি জানো—

"একের চেয়ে চারের পরেই আমার অভিরুচি।"

পান্না কিছু না বলে' মুখ ফিরিয়ে বস্‌ল। মদন তার রকম দেখে একটু হেসে একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—নতুন ভাগ্যবান্‌টি কে?

পান্না এ কথারও কোনো জবাব দিলে না।

সুরো এসে পান্নাকে বল্‌লে—ডাক্তার-বাবু আস্‌ছেন।

পান্না সোজা হয়ে বসে' বল্‌লে—আসুন।

মদন মুখ থেকে সিগারেটটা নামিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ডাক্তার কেন?

পান্না গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে—রোগ হলেই লোকে ডাক্তার ডাকে।

মদন ইতিমধ্যে একবার সিগারেট টেনে নিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ, তা আমি জানি, কিন্তু আমি জান্‌তে চাই তোমার রোগটি কি? হৃদ্‌-রোগ নিশ্চয়। হৃদয়ে পোকার কামড়, একেবারে

ক্ষয় রোগ। এই রোগেই ত তুমি বরাবর মর্‌লে, আর বেচারা প্রণয়টাকে মার্‌লে।

পান্নার মুখ বিরক্তিতে অন্ধকার হয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে আনন্দিত হাসিতে উদ্ভাসিত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল।

মদন পান্নার মুখের অকস্মাৎ এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখে আর পিছনে জুতার শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে দরজার কাছে একজন পুরুষ থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির দীর্ঘ সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, তার গায়ের রং গৌরবর্ণ না হলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ও লাবণ্যে লালিত্যে ঢল্‌ঢল কর্‌ছে; সে মদনের মতন মেয়েলি ছাঁদের সুন্দর না হলেও, তাকে সুপুরুষ বলে' স্বীকার কর্‌তে হয়; তার চেহারায় ও ভাবে পুরুষত্বের গৌরব ও মহিমা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে তাকে সুন্দরতর করেছে। এই লোকটিকে দেখেই মদনের মনে হল—হাঁ এ পুরুষ বটে! মেয়েদের ভালোবাসা দেবার উপযুক্ত পাত্র! পান্না নিশ্চয় একে দেখেই মজেছে—তার মুখের যে হাসি এই লোকটিকে অভ্যর্থনা কর্‌লে সেই হাসি এ কথা ডেকে জানিয়ে দিয়েছে! এই ডাক্তার—ওর পকেট থেকে হৃদয় পরীক্ষার যন্ত্র ষ্টেথেস্কোপ উঁকি মার্‌ছে।

বনবিহারী পান্নাকে দেখ্‌তে এসেই তার কাছে একজন অপরিচিত পুরুষকে বসে' থাকৃতে দেখে দরজার কাছে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল; তার মনটা যে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে একটু ক্ষুণ্ণ হয় নি এমনও নয়।

মদন বনবিহারীকে মুহূর্ত্ত মাত্র দেখে নিয়ে পান্না কিছু বল্‌বার আগেই টপ করে' উঠে দাঁড়াল, এবং হাসিভরা মুখে বিনয়কোমল স্বরে বনবিহারীকে বল্‌লে—এই যে ডাক্তার-বাবু, নমস্কার, আসুতে আজ্ঞা হোক। এখুনি আপনার কথা হচ্ছিল। ইনি আমার শালী, আর আমি এমন শালী লাভ করে' শালীবাহন দি গ্রেট্!

মূল্য ১৲ এক টাকা, বেশী দিবেন না।

দিকে তাকিয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। [৪৯ পৃঃ

এই বলে' মদন কৌতুকভরে হাস্‌তে লাগ্‌ল। মদনের সাম্‌নে বনবিহারী এসে পড়াতে পান্নার মনে যে শঙ্কা ও সঙ্কোচ জেগে উঠেছিল তা মদনের চাতুরীতে নিমেষ-মধ্যে তিরোহিত হয়ে গেল, সেও খুশী হয়ে খিল্‌খিল করে' হেসে উঠ্‌ল। বনবিহারীরও মনের ভাব অনেকখানি লাঘব হয়ে গেল—যাক্‌, এ লোকটা তা হলে তৃষিতার স্বামী নয়।" বনবিহারী এসে পান্না আর মদনের মাঝখানে সোফায় বস্‌ল।

মদন বল্‌তে লাগ্‌ল—এই শালীর হার্ট্‌টা অনেক দিন থেকেই খারাপ হয়েছে—বেচারীর একটি মাত্র ত হার্ট্‌, আমাদের অনেকের টানাটানিতে hurt হবারই কথা।

মদন নিজের রসিকতায় হেসে উঠ্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে পান্না ও বনবিহারীও হাস্‌তে লাগ্‌ল।

মদন আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—কল্‌কাতায় অনেক ডাক্তার কব্‌রেজ দেখানো হল—রোগটা কেউ ঠিক ধর্‌তেই পার্‌লে না; ডাক্তাররা বলে হার্ট ডিজিজ্‌, আর কব্‌রেজ্‌রা বলে ক্ষয়-রোগ। কিছুই স্থির না হওয়াতে শেষে সাব্যস্ত হল কোনো স্বাস্থ্যকর পাড়াগাঁয়ে নদীর ধারে কিছুদিন থেকে দেখ্‌তে হবে তাতে কোনো উপকার হয় কি না। তাই এ এখানে এসে অজ্ঞাতবাস কর্‌ছে। আমি শালীর বিরহ সহ্য করতে না পেরে একবার ছুটে দেখ্‌তে এলাম। এসেই শুন্‌লাম ওর ভাগ্য ভালো—ওর ভাগ্যটা চিরকালই ভালো, নইলে আমাদের মতন গুণধর ভগ্নীপতি পায়?—আপনি ওকে খুব যত্ন করে' দেখ্‌ছেন শুন্‌ছেন। আপনার মতন একজন ভালো ডাক্তারের হেফাজতে ও আছে জেনে আমরা এখন নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌ব।

মদনের কথার স্রোতে বিরাম না পেয়ে বনবিহারী নীরবে মৃদু মৃদু হাস্‌ছিল; এখন মদনকে থাম্‌তে দেখে সে বল্‌লে—চিন্তা কর্‌বার কোনো

কারণ নেই—আমি ত যতদূর দেখেছি তাতে হার্ট কিংবা লাঙ্গসের কোনো দোষ নেই, এ শুধু একটু নার্ভাস্ ডিরেঞ্জমেণ্ট্ বলে' মনে হয়। তা এই শান্ত নিরুপদ্রব জায়গায় কিছুদিন থাক্‌লেই সেরে যাবে।

মদন মুখ গম্ভীর করে, ও স্বর ব্যথাতুর ক'রে তুলে বল্‌লে—আর সার্‌বে! আমার পাষণ্ড ভায়রা-ভাইটার জন্যেই ত এর এই রোগ!—সে একটা বেহদ্দ মাতাল! আর বল্‌ব কি মশায়, এই সোনার অঙ্গে সে ভেড়ের ভেড়ে হাত তোলে! আমি একে আপনার হাতে সমর্পণ করে' যাচ্ছি ডাক্তার-বাবু, আপনি একে দেখ্‌বেন।

এই কথা বলে'ই মদনের এমন হাসি পেল যে সে আর বনবিহারীর পাশে বসে' থাক্‌তে পার্‌লে না, সে সোফা থেকে উঠে গিয়ে বনবিহারীর দিকে পিছন করে' নদীর ধারের জান্‌লায় গিয়ে দাঁড়াল।

মদনের কথা শুনে আর রকম দেখে পান্নারও ভারি হাসি পাচ্ছিল; সে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বনবিহারীর দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে মাথা হেঁট করে' বসল।

মদনের কথা শুনে বনবিহারীর মন পান্নার প্রতি মমতায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল; সে একবার মদনের দিকে ও একবার পান্নার দিকে দৃষ্টিপাত করলে—তার মনে হল মদন তার শালীর দুর্ভাগ্যের দুঃসহ বেদনা অপরিচিত ডাক্তারের কাছ থেকে গোপন কর্‌বার জন্যেই উঠে চলে' গেছে এবং পান্নাও তার দুর্ভাগ্যের লজ্জা ও বেদনা গোপন কর্‌বার জন্যেই মাথা নত করে' বসে' আছে—পান্নার মুখে কাপড় চাপা, হয়ত বা সে কাঁদ্‌ছে। বনবিহারী ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—আপনি এ কথা আমাকে বলে' খুব ভালো করলেন; রোগের কারণ নির্ণয় কর্‌তে পার্‌লে চিকিৎসা সহজ হয়, আরোগ্য অনেকটা নিশ্চিত হয়। যাতে এঁর উপর

কোনো উপদ্রব কি অত্যাচার না হয় তা আমি যথাসাধ্য দেখ্‌ব,—এঁর রক্ষণাবেক্ষণ করা এখন আমার কর্ত্তব্য।

মদন জান্‌লার কাছ থেকে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে বল্‌লে—পান্নার পরম সৌভাগ্য যে সে আপনার মতন একজন বন্ধু পেয়েছে। তা পান্নাকে আপনি এখন দেখুন, আমি স্নান কর্‌তে যাই, আমি এই মাত্র এসে পৌঁছচ্ছি।

বনবিহারী উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—না, ওঁকে দেখ্‌বার আর কিছু দর্‌কার নেই, উনি ত বেশ ভালোই আছেন, আর ভালোই থাক্‌বেন, ওঁকে ভালো থাক্‌তে হবে, আমরা ওঁকে ভালো করে' রাখ্‌ব।

বনবিহারী হাসিমুখে একবার মদনের দিকে চেয়ে পান্নার দিকে চাইলে—দেখ্‌লে পান্নার হাসিমুখের উজ্জ্বল দৃষ্টি থেকে মাধুর্য্য ও মাদকতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বনবিহারীর মনে হল—এই লোকটি বল্‌লে তার শালীর নাম পান্না; কিন্তু উনি আমাকে নিজের নাম বলেছিলেন তৃষিতা। হায় বঞ্চিতা নারী, স্বামীর কাছ থেকে তোমার প্রণয়-পিপাসা মেটে নি, তোমার চিত্ত তাই তৃষাতুর হয়ে আছে!

বনবিহারী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছে দেখে পান্না মনে মনে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে কোমল স্বরে বল্‌লে—বেলা ত হয়েছে ডাক্তার-বাবু, একটু বসুন না, এইখান থেকে একেবারে খেয়ে যাবেন।

পান্নার কথা শুনে মদন বলে' উঠ্‌ল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বেশ হবে, আপনি একটু বসুন ডাক্তার-বাবু, আমি চট করে' স্নান করে' আস্‌ছি।

বনবিহারী হাসিমুখে বল্‌লে—আজকে মাপ কর্‌তে হবে, আমি এই মাত্র বাড়ী থেকে খেয়ে আস্‌ছি। পরাণপুর থেকে একটা ডাক এসেছে, ফির্‌তে রাত্রি হবে, তাই সেখানে যাবার মুখে একবার এঁকে দেখে গেলাম।

মদন হেসে বল্‌লে—আপনি পরাণপুরেও ডাক্তারী করেন দেখ্‌ছি! তা আপনার নেমন্তন্ন রইল, কাল একসঙ্গে খাওয়া যাবে। আপনার কোনো আপত্তি নেই ত, আমরা সোনার বেনে……

বনবিহারী হেসে বল্‌লে—আপত্তি বরং আপনারই হ্‌বার কথা, আপনার ত তবু একটা জাত আছে, আমার সে বালাইও নেই।

মদন হেসে বল্‌লে—আমাদের জাত ঐ নামেই আছে, কাজে নেই। আপনি অনুগ্রহ করে' কাল এখানে আহার কর্‌লে আমরা সুখী হব।

বনবিহারী বল্‌লে—আপনার সঙ্গে পরিচয় হল, নিমন্ত্রণও পেলাম, আপনার জাতের খবরও জানালেন, কিন্তু আপনার নামটিই ত এখনো জান্‌তে পারি নি।

মদন হেসে বল্‌লে—আমার নাম শ্রীমদনলাল বড়াল। আপনার নাম যদিও জান্‌তে পারি নি, তবুও আমি ডাক্তার-বাবুতেই কাজ চালাতে পার্‌ব।

বনবিহারী হেসে বল্‌লে—রোগীর কাছে আমি ডাক্তার-বাবু, কিন্তু বন্ধুর কাছে আমি বনবিহারী।

মদন জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনারা?

বনবিহারী হেসে বল্‌লে—আমার ঐ নাম পর্য্যন্তই পুঁজি, আর কোনো উপাধির উপদ্রব নেই। কাল খেতে খেতে আমার ইতিহাস আপনাকে বল্‌ব। আজ আসি তবে, বেলা হচ্ছে, অনেক দূর যেতে হবে।

বনবিহারী নমস্কার করে' চলে' গেল।

বনবিহারী অদৃশ্য হতে না হতেই পান্না লাফিয়ে উঠে মদনের গলা জড়িয়ে ধরে' মুখচুম্বন করে' বল্‌লে—মদনা, তুই একেবারে হীরের টুক্‌রো! এই জন্যেই ত তোকে এত ভালোবাসি!

সুরো ঝি সেখানে আস্‌তে আস্‌তে গিন্নীমার রকম দেখে এক হাত জিব বার করে' সেখান থেকে পলায়ন কর্‌লে।

*

* *

মধুর কাছ থেকে নীরার সংবাদ পেয়ে মদন বিকালবেলা জলধর-বাবুর বাড়ী গিয়ে হাজির হল। জলধর-বাবুর সঙ্গে সে দেখা করে' বল্‌লে—মশায়ের নাম আর মহত্ত্বের সুখ্যাতি শুনে মশায়কে দর্শন কর্‌তে এসেছি...

জলধর-বাবু এই কথা শুনে ব্যস্ত বিব্রত হয়ে বল্‌লেন—না, না, আমি অতি সামান্য সাধারণ মানুষ। আপনি যে অনুগ্রহ করে' আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন......

মদন ব্যস্ত বিব্রত হয়ে বল্‌লে—না, না, অমন কথা বল্‌বেন, না, আপনি ব্রাহ্মণ, আমি সোনার বেনে......

জলধর-বাবু হেসে বল্‌লেন—ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার আমি অনেক দিনই ত্যাগ করেছি ; আমি মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দিতে চেষ্টা করি, আর মনুষ্যত্বের মধ্যে সাধুতার পূজা করি। আমাদের দেশের চিরন্তন ধারণা সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ। আপনি আমার গৃহে অভ্যাগত, আপনি আমার সম্মাননীয়। আপনার শুভাগমনে আমি সম্মানিত হয়েছি।

মদন জলধর-বাবুর বিনয়নম্র বচন শুনে মনে মনে হাস্‌ছিল, একটু একটু লজ্জাও বোধ হচ্ছিল যে এই ভদ্রলোকের মেয়ের সর্ব্বনাশের উদ্দেশ্য নিয়েই এঁর বাড়ীতে তার অভিযান।

জলধর-বাবু মদনকে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

মদন বল্‌লে—আমার বাড়ী কল্‌কাতায়। আমার এক শালী পীড়িত হয়ে কিছুদিন থেকে আপনাদের গ্রামে এসে বাস কর্‌ছেন—নদীর ধারের বাগান-বাড়টা তাঁর......... "

জলধর-বাবু উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—ও! পরীর বাড়ী! গাঁয়ের লোকেরা সবাই ও-বাড়ীটাকে পরীর বাড়ী বলে, আর তার অধিষ্ঠাত্রীকে বলে পরী—তিনি ত বাইরেও বেরোন না, কারো সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও হয় নি, কোথা থেকে এসেছেন, কি নাম, কোনো পরিচয়ই কেউ পায় নি; রহস্যের জালে জড়িত হয়ে জ্ঞানের অগম্য হয়ে আছেন বলে' সবাই তাঁকে বলে পরী! আজকে তবু পরীর একটু পরিচয় পাওয়া গেল—তিনি আপনার শালী।" এই কথা বলে' জলধর-বাবু খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

মদন হাসিমুখে বল্‌লে—তাঁর অসুখ বলে' তিনি বেরুতে পারেন না, আর তাঁর রোগ যক্ষ্মা বলে' আশঙ্কা থাকাতে তিনি কাউকে বাড়ীতে ডাকৃতেও পারেন না। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লোকহিতকর কার্য্যে দান কর্‌বেন বলে' আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন; তাঁর বিশেষ ইচ্ছা যে এই গ্রামে একটি ছেলেদের আর একটি মেয়েদের অবৈতনিক বিদ্যালয় সত্বর প্রতিষ্ঠা করেন।

জলধর-বাবু উৎসাহিত হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—বাঃ! এ ত অতি সাধু সঙ্কল্প!

মদন হাসি চেপে খাঁটি মিথ্যা কথাগুলো বলে' যেতে লাগ্‌ল—আর তাঁর ইচ্ছা যে একটা হাঁস্‌পাতালও প্রতিষ্ঠিত হয়—তাতে স্ত্রী পুরুষ আর শিশু সকলেরই থাকবার ব্যবস্থা থাক্‌বে।

জলধর-বাবু আবার উৎসাহভরে বলে' উঠ্‌লেন—বাঃ! বাঃ! অতি সাধু সঙ্কল্প!

মদন আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি খোঁজ নিয়ে জান্‌লাম গ্রামের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি······

জলধর-বাবু ব্যস্ত হয়ে বাধা দিয়ে বল্লেন—না, না, আমি অতি সামান্য লোক। ও-পাড়ার নসীরাম মুখুজ্জে, দ্বারিক চক্রবর্ত্তী আর তারাপদ নাগ হলেন এ গ্রামের প্রধান মাতব্বর। আমি আপনাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাব—সকলে মিলে পরামর্শ করে' যাতে কাজ শীঘ্র সুসম্পন্ন হয় তার চেষ্টা করা যাবে।

মদন বল্‌লে—এ কাজ আপনাকেই উদ্যোগী হয়ে কর্‌তে হবে। আমি কার্‌বারী লোক, বেশী দিন ত থাক্‌তে পার্‌ব না। আমার ভায়রা-ভাইটি একেবারে অপদার্থ হতভাগা। যাঁর এই সাধু সঙ্কল্প তিনি স্ত্রীলোক, তাতে কঠিন পীড়িত। তাই আমরা আপনার সুনাম শুনে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, এ কাজের ভার আপনাকে অনুগ্রহ করে' নিতে হবে।

জলধর-বাবু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—না, না, অমন কথা বল্‌বেন না, পুণ্য-কর্ম্মে সাহায্য করে' পুণ্য অর্জ্জন করব। এতে আর অনুগ্রহ কি।

মদন বল্‌লে—এর জন্যে ভালো জায়গা পাওয়া যাবে ত? যা দাম লাগে তা দিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

জলধর-বাবু বল্‌লেন—জায়গার অভাব হবে না, দামও হয় ত দিতে হবে না। নদীর ধারে আমারই কিছু জায়গা আছে, আপনার যদি সেই জায়গা পছন্দ হয়, তা হলে আমি সেই জায়গা এই শুভকর্ম্মে সম্প্রদান কর্‌তে পার্‌লে ধন্য······

জলধর-বাবুর কথা সমাপ্ত হবার আগেই নীরা "বাবা, ও বাবা, বাবা,!" বলে' চেঁচাতে চেঁচাতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরের দরজার সাম্‌নে উপস্থিত হল, এবং ঘরের মধ্যে তার সকালবেলার দেখা ষ্টিমারের বাবুকে বসে'

থাক্‌তে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল—তার মুখে লজ্জা বিস্ময় আনন্দ ও গর্ব্ব একসঙ্গে খেলা করে' তার সুন্দর মুখখানিকে মনোহর করে' তুল্‌লে।

তাকে দেখে মদনের মুখ-চোখে তীব্র লালসা ফুটে উঠ্‌ল। জলধর-বাবু নীরার ডাকে তার দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন বলে' মদনের স্বরূপ ধরা পড়ে' গেল না।

নীরা থম্‌কে দাঁড়িয়ে ফিরে যাই-যাই কর্‌ছে দেখে জলধর-বাবু তাকে বল্‌লেন—এস মা, এস। তুমি যে-পরীর পরিচয় জান্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছ, ইনি সেই পরীর ভগ্নীপতি, এঁর নাম……

মদন এতক্ষণ পর্য্যন্ত জলধর-বাবুকে তার নাম জানায় নি ; জলধর-বাবু নীরাকে মদনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা অসমাপ্ত রেখে মদনের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

মদন তাড়াতাড়ি তার লোলুপ দৃষ্টি সম্বরণ করে' জলধর-বাবুকে বল্‌লে—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীমদনলাল বড়াল।

জলধর-বাবু যেন নামটা জান্‌তেন, ভুলে গিয়েছিলেন, মদন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে এমনি ভাবে বলে' উঠ্‌লেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মদন-বাবু, মদন-বাবু। মদন-বাবু, এটি আমার ছোট মেয়ে, এর নাম নীরা। আমার আর-একটি মেয়ে আছে, তার নাম ধীরা।

তার পর জলধর-বাবু নীরার দিকে ফিরে বল্‌লেন—নীরু-মা, যাও তোমার দিদিকেও ডেকে নিয়ে এস, মদন-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

নীরা তার পিঠের লম্বিত বেণী দুলিয়ে চঞ্চলা কুরঙ্গীর মতন নাচ্‌তে নাচ্‌তে সেখান থেকে চলে' গেল, তার নাচের দোলা লেগে তার বেণী থেকে সেখানে খসে' পড়্‌ল একটি হল্‌দে গোলাপ-ফুল।

মদনের মুখ দিয়ে আর-একটু হলেই বের হচ্ছিল—আপনার মেয়েটি

রূপের-ফাঁদ

তোফা!" কিন্তু বাক্যের শব্দ নির্ব্বাচন, কণ্ঠের কাকু, এবং প্রশংসার আগ্রহ ও আতিশয্য মেয়ের বাপের কানে বিসদৃশ ঠেকতে পারে, এবং আলাপের সূত্রপাতেই বাপের মনে সন্দেহ জাগ্‌তে পারে মনে হওয়াতে সে তাড়াতাড়ি তার মনের উচ্ছ্বাস চেপে গেল।

জলধর-বাবু বল্লেন—আমার ছেলেটি পীড়িত আছে। তার মা তার কাছে আছেন। মেয়েদের একজন কেউ ফিরে গিয়ে তার কাছে বস্‌লে তিনিও তাঁর অতিথির অভ্যর্থনা করতে আস্‌বেন।

মদন শুধু একটু হাস্‌লে এবং মনে মনে বল্‌লে—বুড়ীটা না এলেও ক্ষতি নেই; আমি এসেছি ছুঁড়ীটার সন্ধানে; এখন যদি আর-একটা ফাউ জুটে যাচ্ছে ত বহুত আচ্ছা—যো আপ্‌সে আতা হ্যায় উস্‌কো আনে দেও—অধিকন্তু ন দোষায়—এই একটা জিনিসে মদন বড়ালের কখনো অরুচি হয় না। বেশী দিন এখানে থাক্‌ব না এই যা দুঃখ; আপাতত দু'বোনের মধ্যে যেটা জবর হবে সেটাকেই বাগাতে হবে।

মদনকে নীরব থাক্‌তে দেখে জলধর-বাবু কেবল কথা বল্‌বার জন্যেই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মশায়ের কিসের কার্‌বার আছে?

মদন বল্‌লে—আজ্ঞে, ভাত-ব্যবসা, সোনা রূপো জহরতের গহনার কার্‌বার।

জলধর-বাবু আর মদনে যখন পরিচয় আদান-প্রদান হচ্ছিল, তখন নীরা ছুটে গিয়ে ধীরাকে বল্‌ছিল—দিদি, দিদি, সেই ষ্টিমারেরবাবু এসেছে। কী মজা দিদি! অত বড়লোক, আমাদের বাড়ীতে এসেছে! এস, এস, ঝপ করে' দেখ্‌বে এস!

ধীরা পীড়িত ভাইয়ের শিয়রে বসে' বাতাস কর্‌ছিল, সে গম্ভীর মুখে বল্‌লে—তুই দেখ্‌গে যা। আমার বড়লোক বাবু দেখ্‌বার সময় নেই।

দিদির উদাসীনতায় আশ্চর্য্য হয়ে নীরা বলে' উঠ্‌ল—বা রে! বাবা যে তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে বল্‌লেন। এস না দিদি, ঐ বাবু পরীর ভগ্নীপতি, ওর কাছ থেকে পরীর গল্প শুনব।

পরীর কথা শুনে ধীরার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে উঠ্‌ল; পরীকে সে সিগারেট খেতে দেখেছে, পরী মিথ্যার ফাঁদ পেতে বনবিহারীকে বন্দী করে' তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, সেই হতভাগী সর্ব্বনাশীর পরিচয় এর বেশী জানবার তার দরকার নেই। সে বল্‌লে—তুই বাবাকে বল্‌গে, আমি কিশোরের কাছে বসে' আছি।

মেয়েদের আস্‌তে বিলম্ব হচ্ছে দেখে জলধর-বাবু বৈঠকখানার রকে বার হয়ে ডাক্‌লেন—মা ধীরা, এদিকে একবার এস ত মা।

ধীরা আর যেতে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌লে না, সে উঠে দাঁড়াল; কিন্তু তার মুখ ম্লান গম্ভীর হয়েই রইল।

দিদিকে উঠ্‌তে দেখে কিশোর বল্‌লে—দিদি ভাই, তুমি বেশী দেরী কোরো না।

ধীরা ভাইয়ের মুখের কাছে ঝুঁকে স্নিগ্ধ কোমল স্বরে বল্‌লে—না, ভাই, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।

আগে আগে ধীরা ও পশ্চাতে নীরা গিয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ কর্‌লে। ধীরাকে দেখেই মদন তটস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল; তার মনে হল কোনো রাণী যেন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন; সে দেখ্‌লে ধীরা নীরার মত গৌরাঙ্গী নয়, কিন্তু তার স্নিগ্ধ শ্যামলিমার মধ্যে একটি এমন অনির্ব্বচনীয় লাবণ্য অপরূপ মাধুর্য্য ও কোমল লালিত্য আছে যাতে তাকে রাণীর মতন মহীয়সী করে' তুলেছে; অধিকন্তু তার মুখে যে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্য বিরাজমান তাতে তাকে দেখে সম্ভ্রম ও সম্মানের ভাব মনে আসা অনিবার্য্য।

ধীরার এই মহিমাময়ী মূর্ত্তির পাশে নীরার চটুল চঞ্চলতা অত্যন্ত তুচ্ছ ও কুশ্রী বলে' মদনের মনে হল। পান্নার সৌন্দর্য্য তার কাছে পুতুলের সৌন্দর্য্যের মতন প্রাণহীন অকিঞ্চিৎকর মনে হল ; তাদের নিজের জাতের স্ত্রীলোকেরা সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত, তাদের মধ্যে অনেক সুন্দরীকে সে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেছে, কিন্তু আজ তারা সকলেই এই একটি শ্যামবর্ণা মেয়ের কাছে ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে পড়্‌ল !

যথারীতি পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর জলধর-বাবু ধীরাকে বল্‌লেন—মদন-বাবুকে একটু চা খাওয়াও মা।

সামান্য এক পেয়ালা চায়ের জন্য বা দুটো মিষ্টান্নের জন্যে ধীরার সঙ্গ ও দর্শন–সুখ থেকে বঞ্চিত হতে মদন মোটেই রাজী ছিল না, সে জলধর-বাবুর অনুরোধের প্রতিবাদ করে' বলে' উঠ্‌ল—না, না, এখন আমার চা খাবার দরকার নেই।

জলধর-বাবু হেসে বল্‌লেন—ওটা কি বুঝ্‌লেন—এ পাতে লুচি দাও বলে' নিজের পাতাটার দিকে পরিবেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও একটু চা-দেবীর প্রসাদ পেয়ে যাব।

এর পর মদনের আর আপত্তি করা চল্‌ল না, তার মনে হল ধীরার বদলে নীরাটা গেলেই ত পার্‌ত। ধীরা উঠে যাচ্ছে দেখে সে বল্‌লে—ছোট থাক্‌তে বড়র কোনো কাজ কর্‌তে নেই ; আপনি বসুন, মিস নীরা অতিথি-সেবা কর্‌বেন।

মদন-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নীরার দিকে ফিরে একটু হাস্‌লে।

নীরা বৈঠকখানার দরজায় উপস্থিত হবামাত্র মদনের চোখে মুখে যে আগ্রহ-লোলুপ ভাব ফুটে উঠ্‌তে সে দেখেছিল, দিদিকে ডেকে নিয়ে আসার পর মদনের মুখে সে ভাব সে আর দেখ্‌তে পায় নি ; এতক্ষণ মদন

তার দিদির দিকেই ফিরে দিদির সঙ্গেই কথা কয়েছে, তার দিকে একবার ফিরেও তাকায় নি, একটা কথাও বলে নি, এতে সে অত্যন্ত ক্ষুন্ন ও দিদির উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে বসে' ছিল ; এখন মদনের কথা শুনে আর তার দৃষ্টি ও হাসি দেখে নীরা উৎফুল্ল হয়ে বাতাসে-উড়িয়ে-নিয়ে-যাওয়া এক স্তবক ফুলের মতন ঘর থেকে চল্‌কে বেরিয়ে চলে' গেল—মদন-বাবু তার হাতের তৈরী চা খেতে চেয়েছেন, এই পরম সৌভাগ্যের গর্ব্ব ও আনন্দ সে নিজের অন্তরে আর ধারণ করে' রাখ্‌তে পার্‌ছিল না।

নীরা বাইরে গিয়েই দেখ্‌লে প্রচুর দাঁড়িয়ে আছে, তাকে দেখেই প্রচুর হাস্‌লে ; কিন্তু নীরা আগের মতন হাসির বদলে হাসি ফিরিয়ে না দিয়ে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে চলে' গেল—প্রচুর ত মদন-বাবুর মতন অমন সুন্দর নয়, অমন বাবু নয়, অমন বড়লোক নয়—তার ত নিজের একখানা ষ্টিমার নেই।

প্রচুর নীরাকে ব্যস্ত হয়ে চলে' যেতে দেখে তার পিছনে পিছনে নীরা যে ঘরে ঢুকেছিল সেই ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে নীরা একমনে একটা ষ্টোভ জ্বাল্‌বার আয়োজন কর্‌ছে, নীরা তার দিকে ফিরেও তাকালে না। প্রচুরের মনে হল—রাস্‌কাল্ অনাথটা নিশ্চয় আমার নামে কিছু লাগিয়েছে, পাজীটাকে একবার আমি এইসা মার লাগাব।

প্রচুর ক্ষুণ্ণ ও রুষ্ট মনে সেখান থেকে প্রস্থান কর্‌লে।

বিকালবেলা একবার নীরাকে দেখে নেবার বাসনা অদম্য হয়ে ওঠাতে অনাথ দোকান থেকে পালিয়ে নীরাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত ; নীরার সন্ধানে সে যেতে যেতে দেখ্‌লে নীরা ঘর থেকে কতকগুলো চায়ের পেয়ালা পিরিচ নিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছে। নীরাকে দেখেই অনাথের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। নীরাও অনাথকে দেখে বলে' উঠ্‌ল—এই অনাথ, সেই

ষ্টিমারের মদন-বাবু এসেছে! আমি তার জন্যে চা তৈরি করছি, তুমি চট করে' এই পেয়ালা-পিরিচগুলো ধুয়ে আনো ত।

নীরার কোনো কাজ করতে পেয়ে, অনাথের অনান্দ-সাগর উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ল।

দু পেয়ালা চা হাতে করে' নীরা আর তার পিছনে পিছনে দু রেকাবি খাবার হাতে করে' অনাথ ঘরে এসে ঢুক্‌ল। নীরা চায়ের বাটি এনে মদনের একেবারে গা ঘেঁষে পাশে দাঁড়িয়ে তার সাম্‌নে রাখ্‌ছিল, অপরূপ আনন্দের শিহরণে তার হাত কেঁপে উঠ্‌ল, একটু চা চল্‌কে টেবিলের উপর পড়ে' গেল। মদন নীরার দিকে তাকিয়ে একটু হাস্‌লে।

নীরা মদনের সেই হাসি দেখে সুখাবেশে একেবারে বিবশ হয়ে মদনের পাশের চেয়ারে শিথিল হয়ে বসে' পড়্‌ল।

মদন নীরাকে বস্‌তে দেখে বল্‌লে—আর দু পেয়ালা চা চাই যে।

ধীরা ধীর স্বরে বল্‌লে—আমরা চা প্রায় খাই-ই নে।

মদন হেসে বল্‌লে—প্রায় যখন বল্‌লেন তখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি কখনো কখনো খান; সেই কখনোটা আজকে এখন উপস্থিত হতে বাধা কি?

ধীরা গম্ভীর মুখ নত করে' বল্‌লে—চা খেলে আমার ঘুম হয় না।

নীরাকে কিছু না বলা অশোভন হবে মনে করে' মদন নীরার দিকে ফিরে বল্‌লে—আপনি দিদির দল ছেড়ে আমাদের দলে এসে পড়ুন, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবার কোনো আশঙ্কা নেই বোধ হয়।

তুচ্ছ এক পেয়ালা চা কোন ছার, মদন অনুরোধ করলে নীরা এক পেয়ালা সাপের বিষ হাসিমুখে পান কর্‌তে পার্‌ত; সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকালে।

নীরার দৃষ্টির অর্থ বুঝে ধীরা বল্‌লে—তুই খাস ত চা নিয়ে আয়।

আদেশ পাওয়া মাত্র নীরা তৎপরতার সহিত উঠে যাচ্ছিল, মদন অনুরোধের স্বরে বল্‌লে—এক পেয়ালা চা আর দু রেকাবি খাবার আন্‌বেন।

ধীরা নীরাকে বল্‌লে—অনাথের জন্যেও খাবার নিয়ে আসিস। অনাথ তুমি যেও না, জল খেয়ে যাও, এস, বসো।

মদন অনাথকে দেখে মনে করেছিল সে এ-বাড়ীর চাকর হবে; তাকে ধীরা তাদের সঙ্গে বসে' খেতে অনুরোধ কর্‌লে দেখে মদন অবাক্ হয়ে অনাথের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মদনের দৃষ্টির আঘাতে কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হয়ে অনাথ বল্‌লে,—আমায় দোকানে যেতে হবে, দেরী হয়ে যাবে।

জলধর-বাবু বল্‌লেন—জল খেয়ে যেতে আর কত দেরী হবে হে? বসো।

অনাথ আর আপত্তি কর্‌তে না পেরে আড়ষ্ট হয়ে একখানা চেয়ারে ধীরার পাশে বস্‌ল; খাদ্য পানীয় আন্‌তে নীরাকে সাহায্য কর্‌তে যাবার জন্যে তার মনটা ছট্‌ফট্ কর্‌ছিল, কিন্তু তার নিজের খাবার আন্‌তে হবে বলে' সে আর লজ্জায় যেতে পার্‌লে না।

দু পেয়ালা চা আর তিন রেকাবি খাবার একবারে নিয়ে যাওয়া যায় না, অনাথ এলে দুজনে ভাগাভাগি করে' নিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু অনাথ না আসাতে নীরা অনাথের উপর ভয়ানক চটে' গেল। সে মুখ ভার করে' এক হাতে খাবারের রেকাবি আর এক হাতে চায়ের বাটি এনে অনাথের সাম্‌নে রাখ্‌তে গিয়ে ইচ্ছা করে' খানিকটা গরম চা ছলকে অনাথের গায়ে ঢেলে দিলে।

গরমের ছ্যাঁকা লেগে অনাথ চম্‌কে উঠ্‌ল। নীরা রাগ ভুলে গিয়ে

খিল্‌খিল করে' হেসে উঠ্‌ল ; অনাথ একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে মাথা নীচু করে' বস্‌ল। মদনও হাস্‌তে লাগ্‌ল।

ধীরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে নীরার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—অকম্মার ঢেঁকি কোথাকার ! অকর্ম্ম করে' হাস্‌তে লজ্জা করে না ! যা' চট্‌ করে' তোর খাবার নিয়ে আয়, এঁদের চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

মদন-বাবুর সাম্‌নে তিরস্কৃত হয়ে অভিমানে মুখ ফুলিয়ে নীরা নিজের জন্ত খাবার আর চা আন্‌তে গেল।

যখন সকলে খাচ্ছে তখন বনবিহারী কিশোরকে দেখ্‌তে এল। তার পায়ের শব্দ শুনেই সকলে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে দেখ্‌লে, কেবল দেখ্‌লে না ধীরা—এ পদধ্বনি যে তার বড় চেনা—বসন্তের পদধ্বনি শুনে লতা যেমন কুসুমিতা হয়ে ওঠে, এই একটি লোকের পদধ্বনিতে ধীরারও চিত্ত যে তেমনি আনন্দে সাড়া দিয়ে উঠ্‌তে চায়।

বনবিহারীকে দেখে মদন হেসে নমস্কার কর্‌লে এবং জলধর-বাবু তাকে বল্‌লেন—এই যে বনবিহারী ; এস, এস ; চা-চক্রে বসে' যাও।

বনবিহারী ধীরার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বল্‌লে—না, আমি এখন আর চা খাব না। আমি কিশোরকে আগে দেখ্‌তে যাই।

বনবিহারী আর অপেক্ষা না করে' বাড়ীর মধ্যের চলে' গেল ; সে চলে গেল দেখে জলধর-বাবু চেঁচিয়ে বল্‌লেন—তা হলে যাবার সময় জল খেয়ে যেও, তুমি কিশোরকে দেখে এখানে এসো।

বনবিহারী অরণ্যষষ্ঠীর মেলার দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে লক্ষ্য কর্‌ছিল ধীরার ভাবে ও ব্যবহারে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে, এবং সে পরিবর্ত্তনটা তার অনুকূল নয়। প্রথম প্রথম সে মনে করেছিল এই ভাবান্তরের কারণ ভাইয়ের পীড়ায় উদ্বেগ ; কিন্তু একদিনেই সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে ধীরা

তাকে পরিহার করে' চল্‌তে চাচ্ছে, এবং তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছে! আজ যখন সে দেখ্‌লে ধীরা মদনের সঙ্গে বসে' খাবার খাচ্ছে, এবং সে তার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না, তখন ধীরার বিরাগ সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহই থাক্‌ল না। কিন্তু ধীরার এই অকস্মাৎ বিরাগের কারণ সে ঠিক ধর্‌তে পারছিল না; একবার তার মনে হল মদনের ঐশ্বর্য্যের আকর্ষণে ধীরা তাকে দরিদ্র বলে' উপেক্ষা ও অবহেলা কর্‌ছে; কিন্তু পরক্ষণেই তার আবার মনে হল মদন ত সবে মাত্র আজ এসেছে, এবং এই মাত্র ধীরার সঙ্গে মদনের সাক্ষাৎ ঘটেছে, কিন্তু ধীরার পরিবর্ত্তন ঘটেছে কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে। বনবিহারীর একবার মনে হল সে মেলার দিন ধীরার কাছে প্রতিজ্ঞা করে' বলেছিল—'আজ আমার সমস্ত পসার মাটি হয়ে গেলেও তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না,' কিন্তু সে এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে নি, মেলাতে ধীরাকে ফেলে রেখে সে ছুটে এসেছিল পান্নাকে দেখতে। ধীরার কি তাতে পান্নার উপর ঈর্ষা হয়েছে? ধীরা কি তাকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পারে না? এমন সন্দিগ্ধ মন যার তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করা সসর্পে চ গৃহে বাসঃ। ভাগ্যে বিবাহের পূর্ব্বেই ধীরার এই স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়্‌ল, নইলে ত তার জীবন দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠ্‌ত —সে ডাক্তার মানুষ, তাকে কত রমণীর চিকিৎসা কর্‌তে হবে, এমন স্ত্রী হলে ত ব্যবসা করাই দায়। ধীরাকে না পাওয়ার দুঃখ তার অসহ্য, কিন্তু নিজের সুখের জন্যে সে কিছুতেই তার সঙ্কল্পিত ব্রত থেকে ভ্রষ্ট হতে পারবে না।

বনবিহারীর ফিরে আসতে বিলম্ব দেখে আর অনাথ আড়ষ্ট হয়ে বসে' আছে দেখে জলধর-বাবু বল্‌লেন—অনাথ, তুমি এখন দোকানে যাবে?

অনাথ পলায়নের সুযোগ পেয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল; সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

জলধর-বাবু বল্‌লেন—তা যাও, বনবিহারীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে যেও।

অনাথ চলে' গেল।

বনবিহারী এখনি আস্‌বে এই আশঙ্কায় ধীরা নিজের মানসিক চঞ্চলতা গোপন কর্‌বার জন্যে জোর করে' মদনের সঙ্গে বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হল।

অনাথ ফিরে এসে বল্‌লে—জেঠা-মশায়, ডাক্তার-দাদা চলে' গেছেন।

জলধর-বাবু বল্‌লেন—বনবিহারী কি অক্লান্ত পরিশ্রমই করে, এক মুহূর্ত্ত তার বিশ্রাম কর্‌বার অবসর নেই। মদন-বাবু, আমাদের বনবিহারীর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে দেখ্‌লাম।

মদন হেসে বল্‌লে—হ্যাঁ, উনিই ত এখন আমার শালীর চিকিৎসা কর্‌ছেন।

জলধর-বাবু বলে' উঠ্‌লেন—ও!

ধীরা টপ করে' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিতাকে বল্‌লে—আমি কিশোরের কাছে গিয়ে মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা।

ধীরার অন্তর্ধান ও বুড়ীর আবির্ভাবের সম্ভাবনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে মদন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে ব্যগ্র স্বরে ধীরাকে বল্‌লে—আপনি চলে' যাবার আগে আমার একটি প্রার্থনা মঞ্জুর করে' যান—কোনো দিন বিকালে দয়া করে' যদি আমার ষ্টিমারে পদার্পণ করেন, তা হলে খানিক দূর বেড়িয়ে আসা যায়।

এই প্রস্তাব শুনেই নীরা উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠ্‌ল—বাঃ! সে ত খুব মজা হবে! কবে নিয়ে যাবেন?

ধীরা চকিত দৃষ্টিতে ভগ্নীর চটুলতাকে তিরস্কার করে' পিতার দিকে চাইলে।

জলধর-বাবু কন্যার দৃষ্টির অর্থ বুঝে মদনকে বল্‌লে—আপনার স্ত্রী কি এসেছেন।

এই প্রশ্নে মদনের চৈতন্য হল—কেবল পুরুষের নিমন্ত্রণে মেয়েরা কোথাও যায় না। মদনের উপস্থিতবুদ্ধি তখনই তাকে দিয়ে বলালে—বহুকাল হল আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, আর আমি বিবাহ করি নি। আমার শালী আপনাদের নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে যাবেন সে অবস্থাও তাঁর নয়! আমিই তাঁর হয়ে আপনাদের নিমন্ত্রণ করছি। তাঁর বাড়ীতেও নিয়ে যাবার যো নেই বলে' আমার ষ্টিমারে পায়ের ধুলো......

এমন তরুণ সুকুমার ধনী বিপত্নীক হয়েও আবার বিবাহ করে নি এই কথা শুনেই জলধর-বাবুর মন প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল; তিনি মদনের কথায় বাধা দিয়ে বলে' উঠ্‌লেন—অমন কথা বল্‌বেন না মদন-বাবু, আমরা একদিন আপনার ষ্টিমার দেখ্‌তে যাব।

পিতাকে নিমন্ত্রণ স্বীকার কর্‌তে দেখে নীরার মনে হচ্ছিল উঠে খানিকটা লাফিয়ে নেচে নেয়, কিন্তু দিদির গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে তার সে উৎসাহ তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হয়ে গেল।

ধীরা পিতাকে বল্‌লে—বাবা, কিশোরের অসুখ, আমরা তাকে ফেলে কেমন করে' যাব?

জলধর-বাবু বল্‌লেন—কিশোর ত ক্রমেই ভালো হয়ে উঠ্‌ছে তোমার মা তার কাছে থাক্‌বেন, আমরা অল্পক্ষণের জন্য মদন-বাবুর ষ্টিমারে করে' একটু বেড়িয়ে আস্‌ব।

পিতাকে মদনের নিমন্ত্রণ সম্পূর্ণ স্বীকার কর্‌তে দেখে অধিক আপত্তি

অশোভন হবে মনে করে' ধীরা নীরবে চলে' গেল, মনে মনে সে স্থিরসঙ্কল্প করে' গেল, সে কিছুতেই মদনের ষ্টিমারে যাবে না, পিতাকে সব কথা বুঝিয়ে বল্লে তিনি কখনো যেতে অনুরোধ করবেন না।

ধীরা চলে' যেতেই নীরা বলে' উঠ্ল—আমাদের কবে নিয়ে যাবেন? আপনার ষ্টিমার দেখ্তে আমার এমন ইচ্ছা করছে! ও ষ্টিমারখানার কত দাম?

মদন নীরার এই হ্যাংলাপনায় মনে মনে বিরক্ত হয়ে বল্লে—ঠিক ত মনে নেই, পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা হবে।

নীরা আবার বলে' উঠ্ল—ওর নাম জলতরঙ্গ কে রেখেছিল? আপনি বুঝি? বঙ্কিম-বাবুর আনন্দমঠ পড়ে' বুঝি মনে হয়েছিল?

বোকা অথচ চঞ্চল মেয়েটিকে বেফাঁশ কথা বলা থেকে নিরস্ত করবার জন্যে জলধর-বাবু তাড়াতাড়ি বল্লেন—মা নীরু, তুমিও দিদির সঙ্গে কিশোরের কাছে বসো গে; মদন-বাবুর বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, তোমার মাকে পাঠিয়ে দাও গে।

নীরা অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে চলে' যেতে যেতে বার বার মুখ ফিরিয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মদনকে দেখ্তে দেখ্তে গেল।

•

• •

মদন সেইদিন থেকে রোজ জলধর-বাবুর বাড়ীতে আস্তে লাগ্ল এবং বড় বড় লোকহিতকর অনুষ্ঠানের ফর্দ্দ দিয়ে জলধর-বাবুর নিতান্তই বিশ্বাসভাজন প্রিয়পাত্র হয়ে উঠ্ল।

কিন্তু মদনের এই ঘনিষ্ঠতা ধীরার ভালো লাগ্ছিল না; যে পান্নার

জন্যে বনবিহারীকে সে হারিয়েছে, সেই পান্নার আত্মীয় বলে' মদনের উপরও তার মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। বাড়ীতে অভ্যাগতকে যতটুকু খাতির করা দরকার তার বেশী সমাদর সে মদনকে করত না; মদন এলে সে তার মাকে আর নীরাকে মদনের কাছে রেখে নিজে কিশোরের কাছে কিংবা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকতে চেষ্টা করত। কিন্তু বনবিহারী কিশোরকে দেখ্‌তে এলেই ধীরা তাড়াতাড়ি কিশোরের কাছ থেকে এসে মদনের কাছে বস্‌ত এবং মাকে কিশোরের কাছে পাঠিয়ে দিত। বনবিহারী কিশোরকে দেখে তাদের কাছে যদি কোনো দিন আস্‌ত তা হলে তখন ধীরা প্রাণপণ চেষ্টায় প্রফুল্ল হয়ে মদনের সঙ্গে এমন গল্প জুড়ে দিত যেন তার অন্যদিকে মন দিবার অবসর নেই।

বনবিহারী ধীরার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে তাদের কাছে বেশীক্ষণ থাকতে পার্‌ত না। সে চলে' গেলে ধীরা আবার অকস্মাৎ ধীর গম্ভীর হয়ে' উঠ্‌ত, এবং কোনো একটা ছল উদ্ভাবন করে' যত শীঘ্র পার্‌ত মদনের কাছ থেকে উঠে পালাতে চেষ্টা করত।

চতুর মদন বুঝ্‌তে পেরেছিল তাকে সমাদর করছে বনবিহারীর উপর ধীরার অভিমান, স্বয়ং ধীরা নয়। তাই সে প্রত্যহ বেছে বেছে এমন সময়টিতে আস্‌ত যে সময়ে বনবিহারীর আসার সম্ভাবনা, কোনো কোনো দিন বা সে বনবিহারীকে ডেকে একেবারে সঙ্গে করে' নিয়ে আস্‌ত। মদনের মনে এই দুরাশা জেগে উঠেছিল যে ধীরা বনবিহারীর উপর অভিমানকে দিয়ে তাকে সমাদর করাতে করাতে একদিন হয়ত নিজেই তাকে সমাদর করবে।

নীরার বুদ্ধি একটু কম, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা তার সাধ্যায়ত্ত ছিল না; বনবিহারী এলেই বা ধীরা কেন মদনের কাছে আসে, এবং বনবিহারী

গেলেই বা কেন ধীরা মদনের কাছ থেকে পালাতে চায়, তা সে কার্য্য-কারণসম্পর্করূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। কিন্তু সে এইটুকু বেশ বুঝেছিল যে তার দিদি এসে উপস্থিত হ'লে সে মদনের কাছ থেকে একেবারে উহ্য হয়ে যায়। সে মনে মনে দিদির উপর ঈর্ষান্বিত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, এবং মনে মনে প্রার্থনা করত—হে ঠাকুর, দিদি যেন মদন-বাবুর কাছে না আসে।

একদিন বনবিহারী কিশোরকে দেখে যাবার সময় জলধর-বাবুকে বলে' গেল—কিশোর আজকে অনেকটা ভালো আছে।

জলধর-বাবু উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—মদন-বাবু, কাল বিকালে আপনার ষ্টিমারে বেড়াতে যাব।

জলধর-বাবুর এই কথা শুনে মদনের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল; সে হাসি-মুখে ধীরার দিকে চেয়ে বল্‌লে—কাল আমার ষ্টিমার সোনার তরী হয়ে উঠ্‌বে।

মদনের এই কথা শুনে বনবিহারী ধীরার দিকে চাইলে, কিন্তু ধীরা বনবিহারীর দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে' ছিল বলে' বনবিহারী তার মুখ দেখ্‌তে পেলে না। বনবিহারী একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে সেখান থেকে চলে' গেল।

ধীরা তার পিতার আর মদনের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল; বনবিহারীর সাম্‌নে প্রফুল্ল থাক্‌বার চেষ্টা করে'ও সে প্রফুল্লতা দেখাতে পার্‌লে না, এবং বনবিহারী চলে' যাবার সঙ্গে-সঙ্গে সেও সেখান থেকে উঠে চলে' গেল।

অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠেছিল নীরা। মদন যখন ধীরাকে বল্‌লে—কাল আমার ষ্টিমার সোনার তরী হয়ে উঠ্‌বে।—তখন নীরা বলে' উঠল—

আমাদের পা বুঝি পরশ-পাথর! উঃ! কাল কী মজাই হবে! আমাদের অনেকদূর নিয়ে যেতে হবে কিন্তু ......

মদন নীরার দিকে ভ্রুক্ষেপও না করে' ধীরার চলে' যাওয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে—আজ তবে আমি আসি জলধর-বাবু, কাল আপনাদের অনুগ্রহকে অভ্যর্থনা কর্‌বার আয়োজন করি গে। আমি আজ আবার আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে' যাচ্ছি—আপনাদের পায়ের ধুলো পড়্‌লে আমার ষ্টিমার ধন্য হয়ে যাবে।

নীরা বলে' উঠ্‌ল—তার জন্যে বেশী ভাব্‌বেন না, আমরা পায়ের ধুলো দিয়ে ঠিক ধন্য করে' দেবো।

জলধর-বাবু কন্যার প্রগল্‌ভতা চাপা দেবার জন্যে বল্‌লেন—আপনার বন্ধুত্ব লাভ করে' আমরা ধন্য হয়েছি। আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে আপনি বেশী ব্যস্ত হবেন না।

মদন গমনোন্মুখ হয়ে বল্‌লে—না, ব্যস্ত হয়েও ত কোনো ফল নেই এই পাড়াগাঁয়ে আপনাদের অভ্যর্থনার যোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ কর্‌তে চেষ্টা করা বৃথা।

নীরা বলে' উঠ্‌ল—আপনারা পরীর দেশের লোক, আপনি......

মদন নীরার বাক্যসমাপ্তির জন্যে অপেক্ষা না করে' মুখ ফিরিয়ে একটু ভদ্রতার হাসি হেসে চলে' গেল। নীরা তাতেই কৃতার্থ হয়ে গেল।

*

* *

পরদিন প্রভাতে নীরা ব্যগ্র হয়ে' পিতাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবা, আজ আমরা কখন মদন-বাবুর ষ্টিমারে বেড়াতে যাব ?

জলধর-বাবু বল্‌লেন—বিকালে চারটের সময়।

নীরা সেই সকাল থেকে বেলা চারটার আগমনের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত গুণ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। অনেক কষ্টে বেলা দুটো বাজিয়ে সে একেবারে অস্থির হয়ে' উঠ্‌ল এবং বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হল। সে অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত উগ্র রকমের সাজসজ্জা সমাপ্ত করে' দিদির ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে সেখানে তার দিদি নেই। সেখান থেকে দিদির অনুসন্ধানে নির্গত হয়ে দেখ্‌লে তার দিদি পরম নিশ্চিন্ত হয়ে কিশোরের শিয়রে বসে' তাকে হাওয়া কর্‌ছে। সে দিদিকে নিমন্ত্রণে যাবার জন্যে কিছুমাত্র উৎসুক না দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—দিদি, মদন-বাবু নেমন্তন্ন করে' গেছে, মনে নেই বুঝি ? তুমি এখনও কাপড় ছাড়্‌লে না ?

ধীরা নীরার প্রসাধন-পরিপাট্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে—আমি যাব না।

দিদির গম্ভীর মুখ থেকে এই সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে আনন্দও হল, ভয়ও হল। তার আনন্দ হল এই ভেবে যে তার দিদি না গেলে সে একলাই অবাধে মদনের সঙ্গ ও মনোযোগ লাভ কর্‌তে পার্‌বে ; আর ভয় হল এই ভেবে যে তার দিদি না গেলে যদি তার যাওয়াতে কোনও ব্যাঘাত ঘটে' যায়। সে অবাক্ হয়ে এক মুহূর্ত্ত দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌লে—বেশ্ !

নীরা দিদির উপর রাগ করে' ঘর থেকে ফর্‌কে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়ে তার আনন্দের চেয়ে আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠ্‌ল—সে বাবার কাছে দিদির নামে নালিশ কর্‌তে গেল—দেখ বাবা, দিদি এখনও কাপড় ছাড়ে নি।

আমি তাগাদা করাতে বল্‌লে—আমি যাব না। মদন-বাবু অত করে' যেতে' নেমন্তন্ন করে' গেলেন, দিদি না গেলে তিনি কি মনে কর্‌বেন বলো ত?

জলধর-বাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—এখন ত তিনটে বাজে নি! ধীরা তোমাকে রাগাবার জন্যে বোধ হয় যাব না বলেছে।

নীরা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হলেও একেবারে নিঃশঙ্ক না হতে পেরে মুখ ফুলিয়ে বল্‌লে—না, দিদি মুখ হাঁড়িপানা করে' বল্‌লে, ঠাট্টা করার আনন্দ সে মুখের কাছে ঘেঁসতেও সাহস কর্‌বে না।

জলধর-বাবু হাতের বই নামিয়ে রেখে বল্‌লেন—আচ্ছা চলো, আমি ধীরাকে বল্‌ছি।

নীরাকে সঙ্গে করে' নিয়ে জলধর-বাবু ধীরার কাছে এসে বল্‌লেন—এইবার কাপড়-চোপড় ছেড়ে নেও মা, মদন-বাবুর ষ্টিমারে যেতে হবে।

ধীরা গম্ভীর মুখে বল্‌লে—আমি যাব না বাবা।

জলধর-বাবু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—মদন-বাবু অত করে' বলে গেছেন, তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা না কর্‌লে তিনি ক্ষুণ্ণ হবেন।

ধীরা গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—তোমরা যাও, আমি যাব না।

—কেন যাবে না মা? তোমার যেতে অনিচ্ছা হবার কারণ কি?

—কিশোরের অসুখ·········

—কিশোর ত আজ অনেকটা ভালো আছে, তোমার মা তার কাছে থাক্‌বেন, আমরা গিয়ে না হয় শিগ্‌গির ফিরে আস্‌ব।

ধীরা মুখ নীচু করে' ধীর স্বরে বল্‌লে—মদন-বাবুদের আমার ভালো লাগে না বাবা।

জলধর-বাবু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—কেন? মদন-বাবু ত অতি মহাশয় ব্যক্তি!

ধীরা বল্লে— তা হতে' পারেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা ভালো লোক নয়।

জলধর-বাবু উচ্চ হাস্য করে' বল্লেন—মদন-বাবুর কোন্ আত্মীয়-স্বজনকে তুমি দেখ্লে আর তুমি কি বা পরিচয় পেলে? এক তাঁর শালী পরীরাণী আমাদের গ্রামে এসে বাস কর্ছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত যে তিনি নিজে কারো সঙ্গে দেখা করতে আস্তেও পারেন না, আর কাউকে তাঁর বাড়ীতে যেতে বলতেও পারেন না।

ধীরা ধীর অথচ দৃঢ় স্বরে বল্লে—অসুখ না হাতী! সব মিথ্যে কথা!

জলধর-বাবু ব্যথিত ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্লেন—ছিঃ মা, বিশেষ না জেনে শুনে কাউকে অবিশ্বাস কর্তে নেই, মন্দ বল্তে নেই।

ধীরা কণ্ঠস্বরে জোর দিয়ে বল্লে—আমি শুধু জেনে শুনে নয়, জেনে দেখে বল্‌ছি······

জলধর-বাবু কন্যার দৃঢ়তা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—তুমি কোনও দিন পরীর বাড়ীতে যাওনি, দূর থেকে তুমি যা দেখেছ তাতে নির্দ্দোষ কোনও আচরণকে তোমার হয় ত দূষ্য বলে' মনে হয়েছে।

পরীকে নিন্দার আক্রমণ থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে পিতার চেষ্টা দেখে ধীরা উষ্ণ হয়ে বলে' উঠ্ল—যেদিন কিশোর ডাক্তার-বাবুকে পরীর অসুখের খবর দিতে গিয়ে নিজের অসুখ বাড়িয়ে তুল্লে, সেই দিন মেলা থেকে ফিরে আসবার সময় আমি নিজের চোখে দেখেছি পরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি সিগারেট ফুঁক্ছে! তার মিথ্যা ছলনার জন্যে একটা ছেলে প্রাণ দিতে বসেছিল। সে বড্ড ভালো লোক, না?

ধীরার ঠোঁটের কাছে এসেছিল—একটা ছেলে প্রাণ দিতে বসেছে।

কিন্তু সে কথা বল্লে পাছে কিশোর ভয় পায় ও পিতা মাতা ব্যথা পান এই ভয়ে সে তার উক্তিকে অতীত কালে পরিবর্ত্তিত করে' বল্লে; কিন্তু তার নিজের মনের মধ্যে কিশোরের কুশল সম্বন্ধে একটি উদ্বেগ ও আশঙ্কা প্রবল হয়ে ছিল, ডাক্তারের আশ্বাস-বাক্যেও সেই ভয় দূর বা কম হচ্ছিল না।

কন্যার কথা শুনে জলধর-বাবু মুহূর্ত্ত দুই চুপ করে' থেকে বল্লেন—পরী ডাক্তারকে ডাকতে যেতে কিশোরকে বলেন নি; পরীর যে চাকর আমাদের বাড়ীতে ডাক্তারকে খুঁজ্তে এসেছিল সেও ডাক্তারকে ডেকে দেবার জন্যে আমাদের কাউকে অনুরোধ করে নি; চাকর তার প্রভুর অসুখে ব্যস্ত হয়ে হয়ত পীড়ার অবস্থাটাকে একটু বাড়িয়ে বলেছিল, আর তাই শুনে কিশোর অসুস্থ শরীরে দুপুর রৌদ্রে ছুটে গিয়ে অসুখ বাড়িয়ে তুলেছিল; তার জন্যে পরীকে দায়ী বা দোষী করা যায় না। তাঁর অসুখের ধরণ হয়ত এমন যে অসুখ হলে যায়-যায় অবস্থা হয়, আবার সেই টাল্টা সাম্লে নিলে সহজ সুস্থ মানুষের মতন তিনি উঠে হেঁটে বেড়াতে পারেন। হাঁপানি প্রভৃতি অনেক রোগে ওষুধের ধূম সেবন করা আবশ্যক হয়—সে রকম ওষুধের সিগারেট্ বা সিগার ডাক্তারেরা ব্যবস্থা করে' থাকেন। পরী হয় ত সেই রকম কোনো ওষুধের সিগারেট্ খাচ্ছিলেন। এ আমার অনুমান মাত্র। যদিই ধরো তিনি তামাকের সিগারেট্ই খাচ্ছিলেন, তাতেই বা তাঁকে এমন মন্দ বলা যায় কেমন করে' যে তাঁর সম্পর্ক পরিহার কর্তে হবে? নেশা মাত্রই খারাপ; কোনো রকম নেশা না করাই ভালো; কিন্তু নেশারও ত ছোট বড় ক্রম ও শ্রেণী অনুসারে নিন্দার তারতম্য কর্তে হয়। চা একটি নেশা, আজকাল ঘরে ঘরে মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সেই নেশার বশবর্ত্তী। তামাক তার চেয়ে বড় নেশা; কিন্তু

আমাদের অনেক গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনেরা এই নেশা কর্‌তেন ও করেন, অনেক দেশের মেয়েরাও তামাকের ধূম পান করে' থাকেন; আমাদের দেশের মেয়েরা তামাকের ধূম পান করেন না বটে, কিন্তু তাঁরা আরো খারাপ রকমে তামাক খেয়ে থাকেন—দোক্তা জর্‌দা সুর্‌তি প্রভৃতি নানারূপে তামাক সেবন তাঁরা করে' থাকেন। তোমার মা দোক্তা খান, তার জন্যে তুমি তাঁকে ত্যাগ কর্‌বার কথা কোনও দিন ভাবো নি, আর তার জন্যে তোমার মার প্রতি ভক্তিও এতটুকু কমে নি।

এই বলে' জলধর-বাবু পত্নী ও কন্যার মুখের দিকে চেয়ে হেসে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—পুরুষদের সিগারেট্ খেতে দেখে আমরা অভ্যস্ত, তাই তাদের সেই আচরণ আমাদের চোখে খারাপ ঠেকে না; কিন্তু মেয়েদের পক্ষে সিগারেট্ খাওয়া নূতন বলে' কেবল মাত্র সংস্কারের বশে আমাদের চোখে খারাপ লাগে।

পিতার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে ধীরা একেবারে নিরুত্তর হয়ে গেল, সে পরাজয় স্বীকারের নিদর্শন স্বরূপ পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জাস্নিগ্ধ হাসি হাস্‌লে।

কন্যাকে নিরুত্তর হয়ে হাস্‌তে দেখে জলধর-বাবু প্রফুল্ল হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—তবে ওঠ মা, কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হয়ে নেও, মদন-বাবু উৎসুক হয়ে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা কর্‌ছেন।

ধীরা স্মিত মুখে উঠে দাঁড়াল। কন্যাকে গমনে সম্মত দেখে জলধর-বাবু হাসিমুখে বল্‌লেন—আমিও জামা-চাদরটা গায়ে দিয়ে আসি।

জলধর-বাবু ও ধীরা নিজের নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান কর্‌লেন। সেইখানে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরা—দিদি গমনে সম্মত হওয়াতে সে আনন্দিত হবে কি দুঃখিত হবে তা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না। কণ-

কাল চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে যখন তার ঈষৎ চেতনা হল এবং সে অনুভব করতে পারলে যে তার মা ও ভাই তাকে লক্ষ্য করছেন, তখন সেও ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে গিয়েই সে দেখ্‌লে প্রচুর তাকে এ-ঘর ও-ঘর খুজে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখেই প্রচুর হাসিমুখে এগিয়ে এল। কিন্তু নীরা প্রচুরের পাশ কাটিয়ে চলে' যেতে যেতে মুখ ফুলিয়ে বলে' গেল —আমি এখন মদন-বাবুর ষ্টিমারে বেড়াতে যাচ্ছি।

প্রচুর এই প্রথম নীরার কাছ থেকে উপেক্ষা লাভ করে' মর্ম্মাহত হল; সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাব্‌লে—আমার যদি একখানা ষ্টিমার থাকৃত!

*

* *

নীরা যেমন মদনের ষ্টিমারে অস্‌বার আগ্রহে সমস্ত দিনের অধীর প্রতীক্ষার পর বেলা দুটোর সময় থেকে প্রস্তুত হয়ে বসে' ছিল' মদনও তেম্‌নি ষ্টিমারের-ডেকের উপর চেয়ার পেতে বেলা দুটার সময় থেকেই বসে' বসে' অধীর হয়ে উঠেছিল'—নীরার জন্যে নয়, ধীরার শুভাগমনের জন্যে। বারংবার হাতঘড়ি তুলে তুলে অবশেষে মদন যখন দেখ্‌লে চারটা বেজেছে, তখন সে পাশের টেবিল থেকে হাতীর দাঁতের দূরবীন তুলে নিয়ে ধীরার আগমনের পথের উপর উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত করে' বসে রইল। প্রতি মুহূর্ত্ত-মদনের কাছে যুগ-যুগান্ত বলে' মনে হচ্ছিল। অনেক কষ্টে যখন সাড়ে চারটা বাজ্‌ল, তখন সে দেখ্‌তে পেলে ধীরা আস্‌ছে—গোলাপের সঙ্গে কাঁটার মতন ধীরার সঙ্গে আস্‌ছে জলধর-বাবু আর নীরা; গোলাপ-ফুল পেতে হলে যেমন কাঁটা সুদ্ধই নিতে হয়, ধীরাকে পেতে হলেও তার আনুসঙ্গিক উপদ্রব জলধর-বাবু ও নীরাও তেমনি অনিবার্য্য। ষ্টিমারের

পাশেই জলি-বোট বাঁধা ছিল, মদন তাতে গিয়ে চড়্‌ল; খালাসীরা নৌকা বেয়ে তীরে নিয়ে গিয়ে ভিড়ালে। মদন ডাঙায় নেমে ধীরাকে প্রত্যুদ্গমন করে' অভ্যর্থনা কর্‌তে চল্‌ল। পথের মাঝখানে তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মদন প্রফুল্ল স্মিত মুখে নমস্কার করে' বল্‌লে—আপনাদের পদধূলি পাবার সৌভাগ্য যে আমার হবে, এ আমি কয়েক মুহূর্ত্ত আগেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিলাম না।

মদনের এই কথাগুলি বলা উচিত ছিল জলধর-বাবুকে; কিন্তু সে নমস্কার কর্‌লে ও কথা বল্‌লে ধীরার দিকে চেয়ে; তার কথার মধ্যে আপনারা শব্দ বহু-বচনে প্রয়োগ করেছিল, তাও হয়ত ধীরার গৌরব-বাহুল্যে, অথবা লোকের কাছে চক্ষুলজ্জার খাতিরে।

পিতাকে উপেক্ষা করে' তাকে এই-রকম সম্বোধন করাতে ধীরা লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল, ভদ্রতা রক্ষার খাতিরেও সে কোনও কথা বল্‌তে পার্‌লে না।

জলধর-বাবু মদনের সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে মদন যে কাকে সম্বোধন করে' কথা বল্‌লে, তাঁর কন্যাই-বা লজ্জায় কেন লাল হয়ে উঠ্‌ল সেদিকে লক্ষ্য না করে'ই হেসে বল্‌লেন—আপনার মতন মহতের দুর্লভ সঙ্গ লাভের প্রলোভন দমন কর্‌তে পারি এমন সংযম আমরা এখনও অভ্যাস কর্‌তে পারি নি।

কথা বল্‌তে বল্‌তে মদন তার অভ্যাগতদের নিয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হল। আবার সে ধীরার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—ষ্টীমার ত তীরে ভিড়্‌বে না, নৌকায় চড়ে' ষ্টীমারে উঠ্‌তে হবে। নৌকায় উঠুন।

ধীরা আবার লজ্জিত হয়ে পিতার দিকে ফিরে চাইলে।

জলধর-বাবু কন্যার দৃষ্টির উত্তরে বল্‌লেন—তুমি আগে ওঠ মা।

ধীরা প্রথমে নৌকায় উঠ্‌ল।

নৌকার বুকে প্রথম ধীরার পদার্পণ দেখে মদনের মুখ আনন্দে ও গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল।

ধীরার পর উঠ্‌ল নীরা, নীরার পরে জলধর-বাবু, তার পরে মদন। নৌকার একটা ডাঁসার উপর পাশাপাশি বস্‌ল ধীরা ও নীরা, এবং তাদের সাম্‌নে তাদের দিকে মুখ করে' বস্‌ল জলধর-বাবু ও মদন।

খালাসীরা নৌকা বেয়ে নিয়ে গিয়ে ষ্টিমারের গায়ে ভিড়ালে;

নৌকাটা টল্‌টল্‌ কর্‌ছিল, ধীরা স্থির হয়ে আর দাঁড়াতে পার্‌ছিল না, ষ্টিমারের গায়ের সিঁড়িতে পা তুল্‌তে ইতস্ততঃ কর্‌ছিল পাছে সে টলে' পড়ে' যায়; মদন ধীরার ইতস্ততঃ ভাব বুঝ্‌তে পেরে তাড়াতাড়ি ধীরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, ধীরার হাত ধরে' তাকে ষ্টিমারের সিঁড়িতে তুলে দেবে বলে'।

ধীরা মদনের হাত বাড়ানো দেখেই টপ্‌ করে' সিঁড়ির পাশের পিতলের রেলিং ধরে' দুই লাফে ষ্টিমারের উপরে উঠে গেল। ডেকের উপর পা দিয়ে ধীরা অনুভব কর্‌লে অতি কোমল কিছুর উপর তার পা পড়েছে; কিছু মাড়িয়ে ফেল্‌লে মনে করে' পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌বার আগেই কোমল স্পর্শের অনুভবের সঙ্গে-সঙ্গেই তার মনে হল হয়ত কোনও নরম গালিচার উপর তার পা পড়েছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সে পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে দেখ্‌লে সমস্ত পথটা প্রচুর পুষ্পপল্লব দিয়ে পুরু করে' ঢাকা আছে! কেবল এই রুদ্রা গ্রাম কেন, সমস্ত জেলা উজাড় করে'ও এত ফুল জোগাড় করা সম্ভব নয়; এত ফুল এবং এমন দুর্লভ ফুল এত অল্প সময়ের মধ্যে কল্‌কাতা থেকে কেমন করে সংগ্রহ করে' আনা হয়েছে এই চিন্তার বিস্ময়ে ধীরা যখন মগ্ন ছিল, তখন নীরা ও জলধর-বাবুকে

নিয়ে মদন উপরে এসে ধীরাকে বল্‌লে—বাইরে ডেকের উপর বস্‌বেন, না ক্যাবিনের ভিতরে যাবেন ?

নীরার মন ক্যাবিনের অভ্যন্তর দেখ্‌বার জন্যে কৌতূহলে ও ঔৎসুক্যে একেবারে ফেটে পড়্‌বার মতন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, তাই সে দিদি কিছু বল্‌বার আগেই তাড়াতাড়ি বল্‌লে—বাইরে এখনও রোদ আছে, এখন ভিতরে চলুন, রোদ পড়্‌লে বাইরে আসা যাবে।

মদন নীরার কথার উত্তরে ধীরার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ তাই চলুন।

মদন ক্যাবিনের কপাটের কাছে পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল, তার বাসনা যে ধীরা বিক্ষিপ্ত পুষ্পাস্তরণের বুকে প্রথম পদক্ষেপ করে' ক্যাবিনে প্রবেশ কর্‌বে।

তার উদ্দেশ্য হয়ত বুঝ্‌তে পেরেই ধীরাও এক পাশে সরে' দাঁড়িয়ে বল্‌লে—বাবা, তুমি আগে চলো।

ধীরার কথা শুনে মদনের মুখ ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

নীরা খিল্‌খিল করে' হেসে উঠে বল্‌লে মদন-বাবু কি ঘরের মধ্যে বাঘ ভাল্লুক ছেড়ে রেখেছেন যে তুমি যেতে ভয় কর্‌ছ ? এই দেখ আমি যাচ্ছি—আমাকে বাঘেও খাবে না, ভূতেও ধর্‌বে না।

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে নীরা পুষ্পাস্তীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ক্যাবিনের মধ্যে নেমে গেল।

নীরার পিছনে পিছনে নাম্‌ল জলধর-বাবু ধীরা আর মদন।

ধীরা ঘরের ভিতর গিয়ে দেখ্‌লে ঘরে নাম্‌বার সিঁড়ি আর মেঝে ফুল দিয়ে ঢাকা ; বিবিধ বর্ণের ফুল দিয়ে বিচিত্র নক্‌সা কেটে সরস গালিচা রচনা করা হয়েছে। ক্যাবিনের প্রত্যেক জান্‌লায়, ইলেক্‌ট্রিক ঝাড়ে ও

পাথায় ফুলের ঝালর ঝুল্‌ছে, চেয়ার টেবিলগুলিও পুষ্পাভরণে বিভূষিত। টেবিলের উপর সোনা-রূপার তৈয়ারী সুন্দর কারুকার্য্য-করা কয়েকটি পাত্র সর্‌পোষ দিয়ে ঢাকা আছে—সেগুলিতে খাদ্য আছে অনুমান করা যায়; টেবিলের মাঝখানে একটা উঁচু খুরো-দেওয়া স্থালীর উপর দেশী বিদেশী বিবিধ ফলের মন্দির সাজানো আছে, আর সেই মন্দিরের গায়ে পুষ্পপল্লবের প্রসাধন সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

নীরা সবিস্ময়ে বলে' উঠ্‌ল—উঃ! কত ফুল!

জলধর-বাবু হেসে বল্‌লেন—মদন-বাবু, আপনি যে রাজ্যের ফুল এনে ঢেলে দিয়েছেন!

এই-সব বিস্ময়োক্তির উত্তরে মদন ধীরার মুখের দিকে চেয়ে একটু কেবল হাস্‌লে।

টেবিলের চার পাশে চার খানি চেয়ার পাতা ছিল, তার প্রথম খানিতে সে জলধর-বাবুকে বস্‌তে অনুরোধ কর্‌লে; তার উল্টো দিকের চেয়ারে বস্‌তে অনুরোধ কর্‌লে ধীরাকে; ধীরার ডান্‌ দিকে বসতে দিলে নীরাকে, আর আপনি বস্‌ল ধীরার বাঁ দিকে। খাবার টেবিলের লম্বা দিকের দুপাশে সম্মানিত দুই আসনে মদন জলধর-বাবুকে আর ধীরাকে বসিয়েছিল; কিন্তু নীরা মদনের ঠিক সাম্‌নে আর ক্যাবিনের জান্‌লার দিকে মুখ করে' বস্‌তে পেয়ে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

নীরা চেয়ারে বসে'ই জান্‌লার দিকে দৃষ্টিপাত করে' বলে' উঠ্‌ল—ষ্টিমার যে চল্‌ছে!

ধীরা এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে' একবার পিতার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল এবং একবার টেবিল-ঢাকা কাপড়ের নক্‌সার উপর দৃষ্টিপাত করে' নক্‌সার রেখায় রেখায় আঙুল বুলাচ্ছিল; মদনের সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যাবার

...আমি এখন মদনবাবুর ষ্টিমারে বেড়াতে যাচ্চি... ১০০ পৃষ্ঠা

ভয়ে সে পাশে মুখ ফেরাতে পারছিল না। নীরার কথা শুনে ধীরা জান্‌লার দিকে মুখ ফেরাতেই মদনের সঙ্গে তার চোখোচোখি হল—সে দেখ্‌লে মদন মুগ্ধ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ধীরা তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌তে পার্‌লে কেন মদন জান্‌লার দিকে পিছন ফিরে তার বাঁ দিকে বসেছে—সে যত বার জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে চাইবে তত বারই তার দৃষ্টির সঙ্গে মদনের দৃষ্টি সম্মিলিত হবে।

নীরা বলে' উঠ্‌ল—ষ্টীমার যে কখন চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ল তা আমরা মোটে টেরই পাই নি।

জলধর-বাবু বল্‌লেন—আমাদের সন্ধ্যার আগেই ঘাটে নামিয়ে দেবেন, পীড়িত ছেলেটিকে একলা তার মা'র কাছে রেখে এসেছি।

মদন জলধর-বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—তাই হবে।

খান্‌সামা রূপার বড় ট্রে'র উপর বসিয়ে চা দুধ চিনি এনে টেবিলের উপর রাখ্‌লে।

মদন সেইটে ধীরার কাছে এগিয়ে দিলে। ধীরা বুঝ্‌লে যে চা তৈরী করে' তাকেই পরিবেশন কর্‌তে হবে।

ধীরা উপুড়-করা চারটি জাপানের প্রসিদ্ধ সাৎসুমা পোরসিলেনের পাৎলা ফিন্‌ফিনে স্বচ্ছ বাটির তিনটি উল্‌টিয়ে সোজা করে' বসিয়ে পরম-সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা ঢেলে তিন জনের সাম্‌নে এগিয়ে দিলে। সে নিজে চা নিলে না।

মদন জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি চা নিলেন না?

ধীরা লজ্জিত মৃদু স্বরে বল্‌লে—আমি ত চা খাই না?

মদন খাবারের পাত্রের ঢাকা উদ্‌ঘাটন করে' বল্‌লে—তা'হলে আপনি খাবার নিন।

মদন একে একে সমস্ত পাত্রের মুখ খুলে দিলে—পাত্রগুলি দেশী বিলাতী বিবিধ খাদ্যসম্ভারে সুসজ্জিত। রূপার একখানি ফুলকাটা রেকাবি বাঁ হাতে তুলে নিয়ে মদন তাতে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী তুলে' তুলে' রাখ্‌তে লাগ্‌ল।

তা দেখে ধীরা লজ্জিত ব্যস্ত ভাবে বল্‌লে—ও কী কর্‌ছেন! কত চাপাচ্ছেন?

ধীরার কথায় ও কণ্ঠস্বরে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার আভাস পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে মদন বল্‌লে—বেশী ত কিছু দিই নি, সব রকম এক একটা করে' দিচ্ছি।

ধীরা মধুর হাস্য করে' বল্‌লে—আপনি পঞ্চাশ রকমের খাবার আয়োজন করেছেন, সব রকম একটা করে' দিলেও পঞ্চাশ রকম হয়ে পড়্‌বে; মুন্‌কে রঘু ছাড়া আর কেউ কি এত খাবার একসঙ্গে খেতে পারে?

নীরা হেসে বল্‌লে—আধ-মুনে কৈলাস নিশ্চয় খেতে পারত।

কন্যাদের কথা শুনে জলধর-বাবু হো হো করে' হেসে উঠ্‌লেন।

মদন চকিতে একবার নীরা ও জলধর-বাবুর মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ধীরার হাস্যোদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হাস্যমুখে বল্‌লে—কোন্ খাবার যে আপনাদের রুচিকর হবে তা ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে আমাকে নানাবিধ আয়োজন কর্‌তে হয়েছে; প্রত্যেকটা একটু একটু করে' চেখে দেখে যেটা ভাল লাগ্‌বে সেইটেই বেশী করে' নেবেন।

জলধর-বাবু হেসে বল্‌লেন—এত খাবার একটু একটু করে' চাখ্‌তে চাখ্‌তেই পেট ভরে' টই-টুম্বুর হয়ে যাবে, আর কোনোটা বেশী নিয়ে খাবার উপায় থাক্‌বে না।

মদনকে ভদ্রতার খাতিরে জলধর-বাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে হাস্‌তে

হল, কিন্তু সময় অপব্যয়ের ভয়ে সে বাক্যব্যয় না করে' আবার ধীরার দিকে চোখ ফেরালে। ধীরার দিকে চোখ রেখেই মদন আর দুখানি রেকাবিতে খাবার তুলে নীরা আর জলধর-বাবুর সাম্‌নে এগিয়ে দিলে। মদন একটা বাটি থেকে রূপোর চাম্‌চেতে তুলে একটা মিষ্টান্ন ধীরার রেকাবিতে দিতে যাচ্ছিল, ধীরা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—না না আর কিছু দেবেন না, এই সবই পড়ে' থাক্‌বে, নষ্ট হবে।

মদন বল্‌লে—এ পদ্মের মৃণাল, পদ্মমধুতে পাক করা, কাশ্মীর থেকে এই অপূর্ব্ব মোরব্বা নিয়ে এসেছিলাম।

ধীরা ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—না না আর দেবেন না, একটা ত দিয়েছেন।

মদন কেবল দিদিকে নিয়ে ব্যস্ত দেখে নীরা মদনের মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌বার জন্যে বল্‌লে—কাশ্মীরের মৃণাল পদ্ম-মধুতে পাক করা! আমাকে আর একটা দিন না।

মদন যে মৃণালটি ধীরাকে দেবার জন্যে চাম্‌চেতে করে' তুলেছিল সেইটি নীরার পাতে থপ্‌ করে' ফেলে দিলে।

এইরূপে আহার সমাপ্ত হলে মদন কতকগুলো কাগজ বাক্স থেকে বার করে' জলধর-বাবুর সাম্‌নে রেখে বল্‌লে—হ্যাস্‌পাতাল আর স্কুল কর্‌বার জন্যে দানপত্রের কতকগুলো খস্‌ড়া আমি তৈরী করেছি; আপনি এগুলো একবার দেখে দিলে কায়েমি আইন-সঙ্গত করে' দেবার জন্যে কল্‌কাতায় আমার এটর্নির কাছে পাঠিয়ে দেবো।

জলধর-বাবু উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—বাঃ! আপনি এর মধ্যে এ-সবের লেখা-পড়াও ঠিক করে' ফেলেছেন! সৎকর্ম্মে আপনার উৎসাহ অসাধারণ ও চমৎকার! আপনি যখন খস্‌ড়া করেছেন তখন আমার আর দেখ্‌বার দর্‌কার কি?

মদন বল্‌লে—না, তবু আপনি একবার দেখে দিন, যদি আপনার কিছু পরামর্শ দেবার থাকে।

জলধর-বাবু পকেট থেকে চশ্‌মা বার করতে করতে বল্‌লেন—আচ্ছা।

জলধর-বাবু চোখে চশ্‌মা লাগিয়ে মদনের মিথ্যা দানপত্রের মুসাবিদা পরীক্ষার কার্য্যে একেবারে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

জলধর-বাবুকে মিথ্যার জালে আবদ্ধ করে মনে মনে খুশী হয়ে মদন ধীরাকে বল্‌লে—চলুন আমরা বাইরে যাই, রোদ পড়ে গেছে।

নীরা উৎসাহিত হয়ে বলে' উঠ্‌ল—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুন— এই ঘুপ্‌চির মধ্যে থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ধীরা পিতার অভিমতের জন্য নীরবে পিতার মুখের দিকে চাইলে।

মদনের প্রস্তাব ও নীরার উৎসাহবাক্য জলধর-বাবুর কানে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি ধীরার কোনো উত্তর শুনতে না পেয়ে ভ্রূ ও চশ্‌মার কাঁচের ফাঁকের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিকে ঊর্দ্ধে প্রেরণ করে' ধীরার মুখের দিকে চাইতেই তিনি দেখ্‌লেন ধীরা তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এই দেখে জলধর-বাবু বললেন—তোমরা বাইরে যাও মা, আমি ততক্ষণ এই কাগজপত্রগুলো দেখি।

জলধর-বাবু প্রথম থেকেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে মদন ধীরাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, হয় ত বা প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর বিবেচনায় তাঁর জানা শুনা যুবকদের মধ্যে বনবিহারীকেই তিনি ধীরার স্বামী হবার উপযুক্ততম পাত্র বলে' স্থির করে রেখেছিলেন। এবং ধীরা ও বনবিহারীর অতীত আচরণ ও অনুরাগ দেখে তিনি আশান্বিত হয়েই উঠেছিলেন যে শীঘ্রই একদিন তাদের দুজনের মিলন ঘটাব; কিন্তু সম্প্রতি তিনি এও বুঝ্‌তে পার্‌ছিলেন যে কোনো কারণে ধীরার মন বনবিহারীর উপর

বিরক্ত হয়ে উঠেছে ; এই অবস্থায় মদন তার আগ্রহ ও অনুরাগ নিয়ে ধীরা ও বনবিহারীর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে ; মদনকে বনবিহারীর সমতুল্য মনে না হলেও তাকে ধীরার নিতান্ত অনুপযুক্তও মনে হয় নি— মদন সুরূপ সুপুরুষ বিপত্নীক হলেও তরুণ, ধনী, অমায়িক সভ্য ভব্য, এবং সর্ব্বোপরি সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে অনুরাগী ও উৎসাহশীল। ধীরার বয়স আঠারো বৎসর হলেও এতদিন পর্য্যন্ত সে কোনো পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার ও মিশ্‌বার সুযোগ পায় নি ; ইতিপূর্ব্বে তিনি পশ্চিমে কাজ করেছেন, সর্‌কারী কাজে নিযুক্ত হয়ে এক জায়গায় অধিক দিন বাস কর্‌বারও সুযোগ পান নি, ভিন্নদেশীয়ের আচার-ব্যবহারের তারতম্য পশ্চিমা হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা কর্‌বার পক্ষেও বিশেষ বাধা হয়েছিল ; দেশে ফিরে এসে ধীরা প্রথম বনবিহারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্‌বার সুযোগ লাভ করে। ধীরা যে-পুরুষের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিল তাকেই ভালোবেসেছিল দেখে জলধর-বাবু একটু চিন্তিত ও শঙ্কিতই হয়ে উঠেছিলেন, কেন না বহুর মধ্য থেকে গুণগরিষ্ঠ এক-জনকে নির্ব্বাচন করে' নিতে না পার্‌লে মনোনয়ন কখনও উৎকৃষ্ট হয় না, এবং মনোনীত ব্যক্তির প্রতি অনুরাগও স্থায়ী হতে পারে না। মদনের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই বনবিহারীর উপর ধীরার বিরাগ লক্ষ্য করে' জলধর-বাবু নিজের সন্দেহকে সত্য হতে দেখে খুশীও হয়েছিলেন দুঃখিতও হয়েছিলেন—খুশী হয়েছিলেন নিজের ভবিষ্যৎদৃষ্টির সফলতা দেখে, এবং দুঃখিত হয়েছিলেন বনবিহারীর মতন বাস্তবিক সৎপাত্রের প্রতি ধীরার বিরাগ দেখে। মদন যদি সোনা হয়, তবে বনবিহারী নিশ্চয়ই প্ল্যাটিনাম—সোনার জেল্লা তাতে না থাকুক তবু সে অমূল্য সুদুর্ল্লভ, ধীরা যদি সোনার বাহ্যিক চাক্‌চিক্য দেখে ভুলে প্ল্যাটিনামকে অবহেলা করে, তবে

তার ঠকা হবে, ক্ষতি হবে; কিন্তু খুব বেশী ক্ষতি হবে না এই এক সান্ত্বনা। এই-সব ভেবে চিন্তেই জলধর-বাবু মদনকে ধীরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কর্‌বার সুযোগ দিয়ে আস্‌ছিলেন।

মদনের অনুরোধের সঙ্গে-সঙ্গে পিতাও যখন বাইরে যেতে আদেশ কর্‌লেন তখন ধীরার আর গত্যন্তর রইল না, সে মদনের সঙ্গে সঙ্গে কাম্‌রা থেকে বেরিয়ে ডেকের উপর গেল! নীরাকে কেউ না ডাক্‌লেও সেও মদন ও ধীরার সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

তখন রৌদ্র পড়ে' এসেছে; অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিতচ্ছটা মেঘস্তরে প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র বর্ণসুষমায় সমস্ত আকাশকে মনোহর করে' তুলেছে। বাইরে বেরিয়ে এসেই মদন ধীরার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে' উঠ্‌ল—দেখুন, আকাশের কী সুন্দর শোভা হয়েছে।

রঙের এই মহাসমারোহের দিকে ধীরার দৃষ্টি বাহিরে আসা মাত্র আপনি আকৃষ্ট হয়েছিল, এখন মদনের কথায় তার মুখে সৌন্দর্য্য-সম্ভোগের আনন্দচ্ছটা উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। ধীরার মুখের সেই দীপ্তি দেখে মদন ধীরাকে আনন্দ দান কর্‌তে পারার দুর্লভ সৌভাগ্যে কৃতার্থ হয়ে গেল।

যখন মদন পুলকিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে ধীরার আনন্দদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল তখন নীরা মদনের মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ কর্‌বার জন্যে ব্যগ্রস্বরে বলে' উঠ্‌ল—আমাকে কিছু দেখান না মদন-বাবু!

মদন তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে তার দিকে চেয়ে ঘৃণা ও বিদ্রূপ মেশানো একটু বক্র হাসি হাস্‌লে। তার পর মদন ধীরার দিকে ফিরে বলে উঠ্‌ল—দেখুন, দেখুন একটা মাছরাঙা পাখী একেবারে জলের কাছে ক্রমাগত এক জায়গাতেই উড়্‌ছে; ও নিশ্চয় জলের তলে মাছ দেখ্‌তে পেয়েছে, মাছটা আর একটু উপরে ভেসে উঠ্‌লেই এখনি ছোঁ মার্‌বে।

মদনের কথা শেষ হতে না হতেই মাছরাঙা পাখীটা ঝপ্ করে জলে পড়ে' একটা মাছ মুখে করে' নিয়ে উড়ে চলে গেল।

মদন আপনার কথার সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে ধীরার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে ধীরারও মুখ আনন্দ গোপন কর্‌বার চেষ্টায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে; কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখ ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে উঠ্‌ল দেখে মদনের মুখও মলিন হয়ে গেল; ধীরার মুখ যে অকস্মাৎ কেন মলিন হয়ে গেল তা ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে মদন ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

মাছরাঙা পাখীটা কী রকম ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে মাছটাকে ধরে নিয়ে গেল এবং নিজের সফলতায় পাখীটার ওড়ার মধ্যে কী আনন্দ ঠিক্‌রে গেল, তাই দেখে ধীরার মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই যখন তার মনে হল মাছটা এখনি প্রাণের আনন্দে খেলা কর্‌ছিল, বেচারার সেই আনন্দ-লীলা অকস্মাৎ সাঙ্গ হয়ে গেল, তখনই তার মুখ ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে উঠ্‌ল; তার মনে এই প্রশ্ন জাগ্‌ল—একের বিনাশে অপরের আশা সম্পূর্ণ হয় এই জগৎ-নিয়মের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি?

মদন যখন ধীরাকে আবার প্রফুল্ল করে' তোল্‌বার সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখন নীরা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মদন-বাবু পাখীটা উড়ে কোথায় গেল।

মদন এবার নীরার দিকে ফিরেও তাকালে না।

তখন ষ্টিমার নদীর উজান দিকে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে ভাটির দিকে চলেছিল; পরীর বাড়ীর কাছাকাছি এসেই ষ্টিমারের বাঁশি বেজে উঠ্‌ল। মদন পরীর বাড়ীর নদীর ধারের দোতলার একটা জান্‌লার দিকে তাকিয়ে দেখলে সেই জান্‌লার সাম্‌নে একটা সবুজ পতাকা ঝুল্‌ছে। মদন তাড়াতাড়ি তার হাতের দূরবীনে ফোকাস করে' ধীরার

হাতে দিয়ে ব্যগ্র স্বরে বল্‌লে—দেখুন দেখুন, ঐ জান্‌লাটার দিকে চেয়ে দেখুন......

হঠাৎ অনুরুদ্ধ হয়ে বিশেষ কিছু না ভেবে চিন্তেই যন্ত্রচালিতের মতন ধীরা দুরবীন তুলে চোখে দিলে। পরক্ষণেই ধীরার হাত থেকে দুরবীন খসে' ষ্টিমারের ডেকের উপর পড়ে' গেল।

মদন দুরবীনটা কুড়িয়ে নিয়ে ধীরাকে বল্‌লে—দেখ্‌লেন ত!

নীরা উৎসুক হয়ে বলে' উঠ্‌ল—কী! কী! আমাকে দেখান না।

মদন তখন মুখ যথাসম্ভব ম্লান করে ধীরাকে বল্‌ছিল—দেখ্‌লেন ত আপনি নামগোত্রহীন মরীচিকার পিছনে কী নিস্ফল ছুটাছুটি কর্‌ছেন। আপনি বহু পুণ্যে অর্জন কর্‌বার সাধনার ধন, আপনাকে পেলে জীবন ধন্য মান্‌বে এমন একজন লোক আপনার মুখ থেকে একটু প্রসন্ন সম্মতির ইঙ্গিত পাবার প্রতীক্ষায় মরণান্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌বে...

মদনের কোনো জবাব না পেয়ে নীরা আবার তার মনোযোগ নিজের দিকে আকর্ষণ কর্‌বার জন্যে বল্‌লে—মদন-বাবু, দুরবীনটা একবার আমাকে দিন না।

মদন নীরার দিকে না ফিরে দুরবীন-ধরা বাঁ-হাতটা পিছন দিকে বাড়িয়ে দিলে।

এই অবহেলাতেও কিছুমাত্র না দমে' নীরা মদনের হাত থেকে দুরবীন নিয়ে ধীরা যে দিকে দেখেছিল সেই জান্‌লার দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে, কিন্তু জান্‌লায় দর্শনযোগ্য কিছুই দেখ্‌তে পেলে না, জান্‌লা শূন্য বক্ষ মেলে দাঁড়িয়ে আছে। নীরা চোখে দুরবীন দিয়ে পরীর বাড়ীর সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগ্‌ল কোথাও কিছু দর্শনীয় দেখ্‌তে পায় কি না। বিশেষ কিছু দেখ্‌তে না পেয়ে নীরা আবার

মদনকে ডেকে বল্‌লে—মদন-বাবু, দিদিকে কী দেখালেন আমাকে দেখান না।

মদনের তখন নীরার কথার জবাব দেবার অবসর ছিল না, সে ধীরার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বলছিল—আমি রুদ্রা গ্রামে এসে যে রত্নের সন্ধান পেয়েছি তা হৃদয়ে ধারণ করবার পরম সৌভাগ্য আমার যদি না হয়, তা হলে আমার সমস্ত অর্থ বিত্ত ধন সম্পত্তি সেই সুদুর্লভের স্মৃতির পূজার জন্য এই রুদ্রা গ্রামকেই সমর্পণ করে' আমি চিরবিদায় গ্রহণ করব, সেই একের ভাবনায় আমি তন্ময় হয়ে থাকব; ভারতবর্ষে একনিষ্ঠ সাধক সন্ন্যাসীর অন্ন-বস্ত্রের ভাবনা ভাব্‌তে হয় না।......

ধীরা ষ্টিমারের রেলিং ধরে' আড়ষ্ট আকাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সে যা দেখেছিল তার আঘাতে তার চেতনা যেন মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে উঠেছিল, সে মদনের কথা কতক শুনছিল, কতক শুন্‌তে পাচ্ছিল না, যাওবা শুনছিল তার অর্দ্ধেকের অর্থের দিকে সে মনোনিবেশ করতে পারছিল না। হঠাৎ সে দেখ্‌লে অনাথ নদীর ধারে ধারে ষ্টিমারের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছে আর দুহাত তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে, দেখে বোধ হচ্ছে সে যেন ষ্টিমার থামাতে ইঙ্গিত করছে।

ধীরা ব্যস্ত হয়ে মদনের দিকে মুখ ফিরিয়ে মিনতিব্যাকুল স্বরে বল্‌লে—দেখুন, অনাথ ষ্টিমার থামাতে বলছে, দয়া করে' ষ্টিমারটা থামাতে বলুন।

মাহেন্দ্রক্ষণে অনাথ এসে রসভঙ্গ করাতে মদনের মন বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেও ধীরার অনুরোধ তাকে পালন করতে হল। মদনের হুকুমে ষ্টিমার ঘুরে তীরের কাছে গিয়ে অনাথের সাম্‌নে থাম্‌ল; ষ্টিমারের জলিবোট খুলে খালাসীরা অনাথকে ডাঙা থেকে ষ্টিমারে আনতে গেল।

অনাথ ষ্টিমারের কাছে এসেই নৌকা থেকেই চেঁচিয়ে বল্‌লে—বড়দিদি, তোমরা শিগ্‌গির এস, কিশোরের অসুখ বড্ড বেড়েছে।

ধীরার মুখ অশুভের আশঙ্কায় একেবারে রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে উঠ্‌ল, পরমুহূর্ত্তেই স্নেহব্যাকুল হয়ে তার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, এবং সে কেঁদে ফেলে বল্‌লে—হ্যাঁরে অনাথ, কিশোর বেঁচে আছে ত? বাড়ী গিয়ে তাকে দেখ্‌তে পাব ত?

অনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লে—না না, সে ভয় নেই, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি গিয়ে দেখি কিশোর অজ্ঞান হয়ে গেছে, জেঠিমা একলাটি ব্যস্ত হয়ে ছট্‌ফট্‌ করছেন; চাকরেরা ডাক্তার-দাদাকে খুঁজতে গিয়েছিল, ফিরে এসে বল্‌লে—তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি আপনাদের খবর দিতে ছুটে এলাম।

ধীরার কান্না আবার উথ্‌লে উঠ্‌ল; পড়ীর বাড়ীর জান্‌লার দিকে দেখে যে কান্না তার বুকের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এবং তাকে সে এতক্ষণ প্রাণপণ বলে অন্তরে অবরুদ্ধ করে' রেখেছিল তা এখন কিশোরের সংবাদকে অবলম্বন করে' মুক্ত হবার অবকাশ পেয়ে সবেগে প্রবাহিত হতে লাগ্‌ল।

ডেকের উপরে যে এত কাণ্ড হচ্ছে সে দিকে জলধর-বাবুর খেয়ালই ছিল না, তিনি মদনের মিথ্যা দানপত্র পরীক্ষা করতেই তন্ময় হয়ে ছিলেন। এখন তিনি বাঁহাতে দান পত্র ও ডানহাতে চশমা ধরে' উপরে এসে বল্‌লেন—অতি চমৎকার হয়েছে মদন-বাবু……

পিতার সাড়া পেয়ে ধীরা অনাথের দিক্ থেকে ফিরে পিতার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে' কান্নায় একেবারে গলে' গিয়ে বল্‌লে—বাবা, শিগ্‌গির বাড়ী চল, কিশোরকে হয় ত গিয়ে দেখ্‌তে পাব না।

জলধর-বাবু অকস্মাৎ অশুভ সংবাদে অভিভূত হয়ে কেবল বল্‌তে পারলেন—অ্যাঁ!

তাড়াতাড়ি সকলে নৌকায় নেমে ডাঙায় উত্তীর্ণ হল।

মদন অতিথিদের এগিয়ে দিতে যেতে যেতে ধীরার খুব কাছে ঘেঁসে মৃদুস্বরে বল্‌লে—এখন আপনাকে আমার কিছু বলা অশোভন। আপনাকে আমি যে কথা বলেছি তার উত্তর কি আমার পক্ষে আশাপ্রদ হবে, কেবল এই কথাটি আমাকে যদি বলে' যান তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে অনন্তকাল প্রতীক্ষা করতে পার্‌ব।

ধীরা নীরব। বর্ষার ক্ষান্তবর্ষণ মেঘের মতন ধীরা শোকে ও দুর্ভাবনায় থম্‌থম্‌ কর্‌ছিল।

ধীরার কোনো উত্তর না পেয়ে মদন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমি কি এতটুকু ক্ষীণ আশাও করতে পারি না?

ধীরা মুখ নত করে' অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—না।

ধীরার এই একাক্ষর উত্তর মদনের কাছে কতকটা প্রত্যাশিত হলেও সে কয়েক মুহূর্ত্ত কোনো কথা বল্‌তে পার্‌ল না। তার পর সে কম্পিত কণ্ঠে গাঢ়স্বরে বল্‌লে—তবে এই শেষ দেখা।

মদনের দুই চখের পাতা অশ্রুজলে ভিজে উঠ্‌ল।

সে আবার ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে হঠাৎ জলধর-বাবুর সাম্‌নে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে।

জলধর-বাবু আশ্চর্য্য ও ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—একি করেন মদন-বাবু?

মদন ধীর শান্তস্বরে বল্‌লে—আজ রাত্রেই আমাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে। আমি কল্‌কাতায় গিয়েই একজন ভালো ডাক্তার পাঠিয়ে দেবো।

বনবিহারী-বাবু নানান কাজে আজকাল ব্যস্ত থাকাতে কিশোরের চিকিৎসার ত্রুটি ঘট্‌ছে। কিশোরের সুস্থ হবার সংবাদ পেলে আমার দানপত্র রেজিষ্টারি করে' আপনাকে পাঠিয়ে দেবো। আমার পাথেয় আমি আর একটু নিয়ে যাই, আমাকে বাধা দেবেন না।

মদন আবার নত হয়ে জলধর-বাবুর পায়ের ধুলা নিলে। জলধর-বাবু এবার আর তাকে বাধা দিলেন না, স্তব্ধ ম্লান মুখে নীরবে মদনের মাথার উপর হাত রাখ্‌লেন।

মদন ষ্টিমারে ফিরে গেল।

*

* *

জলধর-বাবুরা দ্রুতপদে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখ্‌লেন কিশোরের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের দেখেই কিশোরের মা কেঁদে উঠ্‌লেন। ধীরারও ক্রন্দন নানা কারণে উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌তে চাচ্ছিল, কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টায় বক্ষের মধ্যে সকল দুঃখ অবরুদ্ধ রেখে শক্ত হয়ে মার গলা জড়িয়ে ধরে' মৃদুস্বরে বল্‌লে—চুপ করো মা, কিশোর ভয় পাবে।

ধীরার মা কন্যার কথায় ক্রন্দন সম্বরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

জলধর-বাবু কিশোরের নাড়ী দেখে বল্‌লেন—ধীরা মা, বনবিহারীকে খুঁজ্‌তে আর-একবার কাউকে পাঠিয়ে দাও।

জলধর-বাবুর কণ্ঠস্বর বাষ্পাকুল।

ধীরা ক্রন্দন-কম্পিতস্বরে বল্‌লে—কাউকে আর খুঁজতে যেতে হবে না বাবা, তুমি ওকে হোমিওপ্যাথিক ওষুদ দাও।

জলধর-বাবু মৃদুস্বরে ঈষৎ প্রতিবাদের ভাবে বললেন—এলোপ্যাথিক চিকিৎসা চল্‌ছে……

ধীরা ঈষৎ কঠোর-স্বরে বল্‌লে—তা কি করা যাবে? ডাক্তারকে এখন পাওয়া যাবে না।

জলধর-বাবু কন্যার মুখের দিকে একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের ঔষধ দিলেন।

কিশোরের হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল, গা ঘাম্‌ছিল। জলধর-বাবু কিশোরের হাতে ও ধীরা পায়ে হাত ঘসে' ঘসে' উত্তপ্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন, এবং কিশোরের মা তার গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিতে লাগ্‌লেন।

নীরা বাবা আর দিদির সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সে একবার বাইরে গিয়ে অনাথের সঙ্গে গোপনে কথা বল্‌বার জন্যে অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। জলধর-বাবু কন্যার চাঞ্চল্যের যথার্থ কারণ বুঝ্‌তে না পেরে মনে কর্‌লেন কিশোরের অবস্থা দেখে নীরা বোধ হয় ভয় পেয়েছে, তাই তাকে বল্‌লেন—নীরু মা, তুমি এখান থেকে যাও। বাবা অনাথ, তুমি একটু নীরার কাছে থেকো।

নীরা যা চাইছিল অনায়াসে পিতার আদেশে তাই ঘটে' গেল দেখে সে খুশী হয়ে আসন্নমৃত্যু ভাইকে ফেলে বেরিয়ে চলে' গেল। নীরার পিছনে পিছনে অনাথও বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরে গিয়ে দুজনে চুপ করে বস্‌ল; দু'জনেরই মন যে কথা বল্‌বার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিল, বাড়ীতে বিপদের সম্ভাবনা তাদের সে কথা ব্যক্ত কর্‌তে বাধা দিচ্ছিল; কাজেই তারা দু'জনেই চুপ করে' আড়ষ্ট হয়ে বসে' রইল। দু'জনেই মুখোমুখি হয়ে বসে' আছে, অথচ একটাও কথা বল্‌ছে না, এ অবস্থাও তাদের কাছে বিসদৃশ ঠেক্‌ছিল; তাই দু'জনেই

প্রথম কথা পাড়্‌বার একটা সূত্র অন্বেষণ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে' থাকার পর নীরা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে' বল্‌লে—কিশোরের অসুখ বাড়ার খবর তুমি কেমন করে' পেলে?

নীরাকে যাহোক কিছু একটা প্রথম কথা বলতে শুনে অনাথ হাঁপ ছেড়ে বেঁচে গেল; সে কুন্ঠিত-স্বরে বল্‌লে—তুমি যে জিনিস আন্‌তে বলেছিলে, সেই জিনিষটা আজকে এসে পৌঁছেছে, তাই তোমাকে দিতে এসেছিলাম······

নীরা উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠ্‌ল—এনেছ না কি? দেখি দেখি!

অনাথের মুখ লজ্জায় ও ভয়ে লাল হয়ে উঠ্‌ল, সে চোরের মতন কুন্ঠিত সঙ্কুচিত ভাবে ঘরের চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পকেট থেকে বার করলে এক কৌটা সিগারেট্।

নীরা পরম আগ্রহভরে হাত বাড়িয়ে কৌটাটি নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলে—এর মুখে তেম্‌নি সোনালি দেওয়া আছে ত?

অনাথ লজ্জার সঙ্কোচে নীরার মুখের দিকে তাকাতে পার্‌ছিল না, সে মুখ নীচু করে' মৃদুস্বরে কেবল বল্‌লে—হ্যাঁ।

যে দিন কিশোর অরণ্যষষ্ঠীর মেলায় গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে, সেই দিন কিশোরকে নিয়ে গরুর গাড়ীতে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে নীরাও পরীর বাড়ীতে পান্নাকে সিগারেট্ খেতে দেখেছিল; তার পর একদিন নদীর ঘাট থেকে সে বাড়ী ফির্‌ছিল, পরীর বাড়ীর জান্‌লা থেকে একটা আধ-পোড়া জলন্ত সিগারেট্ তার সাম্‌নে এসে পড়্‌ল। সে চোখ তুলে দেখ্‌লে জান্‌লা থেকে পান্না সরে' গেল। নীরা চকিতে একবার চারিদিকে চেয়ে নিয়ে যখন দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই, কেউ তাকে দেখ্‌ছে না, তখন সে সেই উচ্ছিষ্ট সিগারেট্‌খণ্ড তুলে নিলে; সে দেখ্‌লে সিগারেটের এক

প্রান্ত সুবর্ণ-রঞ্জিত, এবং তার গন্ধ উন্মাদন, সিগারেটের সৌষ্ঠব রূপ ও সুগন্ধ দেখে মুগ্ধ হয়ে সে আর-একবার এদিক্-ওদিক তাকিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটের সোনালি দিক্‌টা সন্তর্পণে ও সসম্ভ্রমে ঠোঁটের উপর স্পর্শ করিয়ে ধীরে ধীরে ঈষৎ টান দিলে ; টান দিয়েই সে বিষম কাশ্‌তে লাগল। তখন সে মাটিতে ঘাসের উপর সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা চেপে ধরে' আগুন নিভিয়ে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। যে পরীর বাড়ী তার কল্পনার স্বর্গ, যে পরী স্বর্গের অপ্সরার চেয়েও রহস্যাবৃত, সেই পরী এই সিগারেট খায় ; যে মদন তার চোখে আদর্শ পুরুষরূপে সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই মদনও এই-রকম সোনামুখী সিগারেট খায় ; সিগারেটের নিজের রূপও অসাধারণ সুশোভন ; কাজে-কাজেই এই সিগারেট খাওয়ার বিপুল প্রলোভন তাকে পেয়ে বস্‌ল। সে বাড়ী থেকে দূরে গিয়ে কোনও বাগানের মধ্যে ঢুকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে সেই আধপোড়া সিগারেটটি রোজ অন্তত একবার একটু করে খেয়ে আসত ; এর জন্যে তাকে কাশ্‌তে হত খুবই, কিন্তু তবু সিগারেটের মোহ তাকে ত্যাগ কর্‌ছিল না। অল্পে অল্পে সিগারেটের ধোঁয়া যখন তার কতকটা সহ্য হয়ে এল তখন সেই সিগারেট্‌টুকু গেল ফুরিয়ে। অনেক ভেবে চিন্তে অনেক ইতস্ততঃ করে' সে অনাথকে ঐ-রকম সোনামুখী সিগারেট আনিয়ে দিতে ফর্‌মাস্ করেছিল। অনাথের কাছে নীরার ইচ্ছা মানে হুকুম। সে নিজে সিগারেট্ খায় না, সিগারেট্ খাওয়া সে গর্হিত মনে করে ; তাই নীরার অনুরোধ শুনে সে অত্যন্ত লজ্জিত সঙ্কুচিত ও ভীত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সে নীরার আদেশ পালন করতে অস্বীকার করতে পারে নি। অনাথ যে দোকানে চাক্‌রী করে সেই দোকানে যত রকম সিগারেট্ আছে তার প্রত্যেক বাক্‌স খুলে বেচারা সন্ধান করেছিল, কিন্তু সোনামুখী

সিগারেটের শুভদৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য তার ঘটে' উঠ্‌ল না। তখন সে ইংরেজি কাগজ খুঁজে খুঁজে কল্‌কাতার এক দোকানে এই সোনামুখী সিগারেটের ফর্‌মাস পাঠিয়েছিল; সেই সিগারেট আজ এসে পৌঁছেছে, সে দোকানের টাকা চুরি করে' ভি পি পার্শেল গ্রহণ করে' নীরাকে পূজার অর্ঘ্য প্রদান করতে এসেছে।

নীরা কৌটা খুলে সিগারেটের সুবর্ণকান্তি দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল; সিগারেটের কৌটাটা জামার গলা গলিয়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিয়ে মধুর হাসিতে অনাথকে কৃতার্থ করে' নীরা বল্‌লে—আমাকে আজ রাত্রেই কিছু টাকা এনে দিতে পারো?

নীরা অনাথের সঙ্গে হেসে কথা কয়েছে, কিছু একটা জিনিস অনাথের কাছে চেয়েছে, সকলের কাছ থেকে যা গোপন কর্‌তে হবে এমন ব্যাপার কেবল মাত্র এক অনাথকে জান্‌বার সৌভাগ্য সে দিয়েছে, এতেই অনাথ কৃতার্থ হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কত টাকা?

নীরা খপ্‌ করে' অনাথের হাত চেপে ধরে' বল্‌লে—যত বেশী দিতে পারো ততই ভালো।

অনাথ নীরার করস্পর্শে একেবারে বিবশ ও শিথিল হয়ে একটু ভেবে ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—তা হলে ত আমাকে এখনি দোকানে যেতে হয়।

নীরা বল্‌লে—যাও, যত শিগ্‌গির পারো নিয়ে এসো, একশো দুশো পাঁচশো......

অনাথ নীরার সুবৃহৎ ফর্‌মাস্‌ শুনে একটু দমে' গিয়ে বল্‌লে—জেঠা মশায় যে আমাকে তোমার কাছে থাকতে বল্‌লেন...

সতী শুভ্রা নদীর ধারে একটি সোফার উপর শুয়ে নদীর জলের উপর জোছনার ঝিকিমিকি দেখ ছিল। (৩২ পৃষ্ঠা)

নীরা বল্‌লে—এখন কেউ তোমাকে খুঁজবে না। যদি কেউ খোঁজে আমি বলে' দেবো তুমি এখনি ফিরে আসবে বলে' কাছেই কোথাও গেছো।

অনাথের যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। সে উঠে ধীর মন্থর-পদে চিন্তাকুল চিত্তে ম্লানমুখে দোকানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান কর্‌ল।

*

* *

মদনের ষ্টিমারে ধীরা আজ বেড়াতে যাবে স্থির হয়ে যাবার পর মদন পান্নার সঙ্গে পরামর্শ করে' এই ঠিক করেছিল যে মদনের সঙ্গে ধীরার মিলন ঘটিয়ে দিতে পান্না মদনকে সাহায্য কর্‌বে, এবং পান্নার সঙ্গে বনবিহারীর মিলন ঘটিয়ে তুল্‌তে পান্নাকে মদন সাহায্য কর্‌বে; ধীরা যখন মদনের ষ্টিমারে নদী বিহার কর্‌তে যাবে তখন পান্না বনবিহারীকে তার বাড়ীতে ডেকে পাঠাবে, এবং তাকে নিয়ে নদীর ধারের জান্‌লার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, আর মদনও ধীরার কাছ ঘেঁসে দাঁড়াবে; পান্না বন-বিহারীকে বুঝিয়ে দেবে ধীরা বনবিহারীর প্রতি আর অনুরাগিণী নয়, সে এখন মদনের প্রণয়ে পাগল এবং মদন ধীরাকে বনবিহারী ও পান্নার একত্রা-বস্থান দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে বনবিহারী দুশ্চরিত্র পরস্ত্রীর প্রণয়াসক্ত, এইরূপে ধীরা ও বনবিহারীর মন পরস্পরের প্রতি বিরূপ ও বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লে তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ নিকটস্থ আশ্রয়কেই অবলম্বন করে' প্রকৃতিস্থ থাক্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

বিকাল বেলা ধীরা যখন মদনের ষ্টিমারে বেড়াতে গিয়েছিল তখন

বনবিহারী আপনা হ'তেই পান্নার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল' পান্নাকে আর বনবিহারীকে ডেকে পাঠাবার কষ্ট স্বীকার করতে হয় নি : গতকল্য জলধর-বাবু যখন মদনের ষ্টীমারে যাওয়ার কথা মদনকে বলছিলেন তখন বনবিহারী সেখানে উপস্থিত ছিল ; ধীরা মদনের ষ্টিমারে বেড়াতে যাবে, অথচ তার সেখানে নিমন্ত্রণ হয় নি এতে বনবিহারীর মন ঈর্ষান্বিত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছিল ; বিকাল বেলা তার কিশোরকে দেখ্‌তে যাবার সময়, কিন্তু আজ সে কর্ত্তব্য পালন করতেও ধীরাশূন্য ধীরার বাড়ীতে যেতে পারলে না ; দুঃখভারাক্রান্ত মনকে অন্যমনস্ক রাখ্‌বার জন্যে সে পান্নার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। মদনের কাছে পান্নার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে পান্না বনবিহারীকে নিয়ে নদীর ধারের জানলায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল ; তারা যে জানলার ধারে উপস্থিত আছে এই সংবাদ জানাবার সঙ্কেত স্বরূপ পান্না জানলায় একটা সবুজ পতাকা লটকে দিয়েছিল ; এবং ষ্টিমার যে পান্নার বাড়ীর ঠিক সাম্‌নে এসে উপস্থিত হয়েছে এই জানাবার জন্যে ষ্টিমারের সারেং প্রভুর পূর্ব্ব-আদেশ অনুসারে বাঁশী বাজিয়ে সঙ্কেত করেছিল। ষ্টিমারের বাঁশী বেজে উঠ্‌তেই পান্না ঢলে' বনবিহারীর বুকের উপর গড়িয়ে পড়্‌ল পান্না মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে মনে করে' বনবিহারী তাকে দু'হাত দিয়ে ধরলে, আর ঠিক সেই সময়ে মদনের দেওয়া দূরবীনের ভিতর দিয়ে ধীরা দেখ্‌লে বনবিহারী পান্নাকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে' দাঁড়িয়ে আছে। এই অবিশ্বাস্য ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে ধীরার হাত থেকে দূরবীন খসে' পড়ে' গিয়েছিল এবং সর্ব্বনাশের হাহাকারে তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ; বনবিহারী পান্নাকে মূর্চ্ছিত মনে করে' দু'হাত দিয়ে ধরে' সন্তর্পণে নিকটের সোফার উপর শুইয়ে দিয়ে নত হয়ে তাকে পরীক্ষা করছিল, তাই নীরা দূরবীন লাগিয়ে অনুসন্ধান করে'ও দ্রষ্টব্য কিছু

দেখ্‌তে পায় নি। ধীরা বনবিহারীকে যে অবস্থায় স্বচক্ষে দেখে গিয়েছে তার পর ভাইকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাবার জন্যেও সেই ডাক্তারকে ডাকৃতে সে সম্মত হতে পারে নি।

বনবিহারী পান্নাকে মূর্চ্ছাপন্ন মনে করে' তার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হয়েছে এমন সময় বাড়ীর নীচের তলায় একজন অপরিচিত পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে চাকরদের জিজ্ঞাসা করছে—তোমাদের মা-ঠাকৃরুণ কোথায় আছেন, কি করছেন? তোমরা সব ভালো ছিলে ত?

যে পান্না চোখ বুজে তনুলতা এলায়িত করে' মূর্চ্ছিতের মতন পড়ে' ছিল সে ঐ কণ্ঠস্বর শোন্‌বা মাত্র বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন ধড়মড়িয়ে উঠে বসে' ভয়ব্যাকুল ব্যস্ত-স্বরে বলে' উঠ্‌ল—আমার সেই মাতাল স্বামীটা কোথা থেকে আবার ফিরে এসেছে, এসে আমার কাছে যদি আপনাকে দেখ্‌তে পায় তা হলে আর রক্ষা রাখ্‌বে না—সে ত এমনি অমাকে মারে, আজ একেবারে খুন করে' ফেল্‌বে। আপনি চট্ করে' এই দিক্ দিয়ে ঘাটের দিকের ঘুরোনো সিঁড়ি দিয়ে চলে' যান……

সিঁড়িতে লোক ওঠার জুতোর শব্দ শুন্‌তে পাওয়া গেল।

পান্না অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও বাস্ত হয়ে বনবিহারীকে আবার বল্‌লে—আপনি যান যান, আর দাঁড়াবেন না……

বনবিহারী সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাঝের দরজা ভেজিয়ে দিলে; সে তখনই নীচে চলে' গেল না, সে দরজার পাশে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল—পান্নার নরপিশাচ স্বামীটাকে একবার দেখে যাবার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং সেই পশুটা যদি কোনও কারণে পান্নার কোমল অঙ্গে হাত তোলে তা হলে তাকে আচ্ছা রকম শিক্ষা দিয়ে দেবে এ উদ্দেশ্যও তার মনের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল।

বনবিহারী কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—উপরে উঠে এল প্রণয়, ম্লানমুখ কৃশদেহ—যেন দুঃখ ও হতাশার প্রতিমূর্ত্তি।

প্রণয়কে দেখেই পান্না রূঢ় কর্কশ স্বরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল—তুমি আবার আমাকে জ্বালাতে এলে কেন? আমাকে কি তুমি দশ দিনও সোয়াস্তিতে থাক্‌তে দেবে না?

প্রণয় শান্ত কাতর স্বরে বল্‌লে—তোমাকে সুখী করে' তোমার হাসি-মুখ দেখ্‌বার জন্যে আমি ইহকাল পরকাল দুইই খুইয়েছি; তোমার একটু হাসিমুখ দেখ্‌বার জন্যে আমার আত্মীয় স্বজন অর্থ বিত্ত চরিত্র মনুষ্যত্ব সব তোমার চরণে বিসর্জ্জন দিয়েছি·········

পান্না হৃদয়হীনার মতন হেসে উঠে বল্‌লে—নে নে, তুই থাম প্রণয়, তোর ঐ ন্যাকামি প্রেমের বক্তৃতা রাখ্‌। আমি কী তোর বিয়ে-করা স্ত্রী যে পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়েই কৃতার্থ হয়ে থাক্‌ব? বেশ্যা রাখ্‌বার সখ মেটাতে হলে একটু খরচ হবারই ত কথা······

প্রণয় ব্যথিত হয়ে বল্‌লে—পান্না, তোমাকে আমি কখনও সুলভ বারবিলাসিনী মনে করি নি, আমি তোমাকে একনিষ্ঠ ভালবাসা দিয়ে দেবীর মর্য্যাদা বরাবর দিয়ে এসেছি। তোমাকে আমি এত বেশী ভালো-বাসি যে অপরের প্রতি তোমার পক্ষপাত ও অনুরাগ দেখেও আমার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয় না। আমি দেখে এসেছি নদীতে মদনের বোট্‌ বাঁধা রয়েছে; আমার আগমন যে তোমার অপ্রীতিকর হবে তা আমি জানি; আমি বাড়ীতে না ঢুকে' বাইরে থেকেই চলে' যেতাম, কিন্তু তুমি আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলে, সেই টাকা দিতে এসেছি, এখন দিয়ে না গেলে হয় ত আর দেবার অবসর পাব না, শীঘ্রই আমাকে বহুদূরে চলে' যেতে হবে······

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে প্রণয় পকেট থেকে এক তাড়া নোট্‌ বার করে' পান্নার সামনে রেখে বল্‌লে—এতে বিশ হাজার টাকার নোট্‌ আছে, তোমাকে দিলাম,—এই আমার শেষ উপার্জ্জন, আমার সর্ব্বনাশের এই শেষ উপহার! তুমি হাসিমুখে গ্রহণ করে' আমাকে বিদায় দাও।

পান্না ভীতস্বরে বলে' উঠ্‌ল—তোমার ব্যাঙ্ক্‌ থেকে চুরি-টুরি করে' নিয়ে এসেছ না কি? না বাপু, তোমার এ-সব টাকা কড়ি আমি চাই নে, তোমার টাকা নিয়ে তুমি ভালোয় ভালোয় এসোগে, শেষকালে কি চোরাই মাল রেখে আমি সুদ্ধ বিপদে পড়্‌ব?

প্রণয় বল্‌লে—না, তোমার কোনও ভয় নেই, আমি যে এই টাকা তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি এ-কথা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌বে না। তবে চল্‌লাম, তোমার কাছে থাকার লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু তুমি আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকৃবে এও আমার অসহ্য……

বনবিহারী পান্নার বাড়ীতে আর অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ল না, সেখানকার সমস্ত বাতাস অকস্মাৎ দূষিত হয়ে উঠে যেন তার শ্বাস রুদ্ধ করে ফেল্‌ছিল, তার দৃষ্টির সাম্‌নে থেকে একটা যেন যবনিকা সরে' গেল, সে বুঝ্‌তে পার্‌লে পান্নার অসুখ মিথ্যা ছলনা, বারবিলাসিনীর তৃষিত বাসনার কাছে তাকে নূতন বলি কর্‌বার কৌশলপূর্ণ আয়োজন।

বনবিহারী পান্নার বাড়ী থেকে বেরিয়ে একছুটে ধীরার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল; সে বুঝ্‌তে পার্‌লে নারী যত সহজে অপর নারীর চরিত্র বুঝে নিতে পারে পুরুষে তেমন পারে না, তাই ধীরা পান্নাকে ভালো করে' না দেখেও পান্নার স্বরূপ বুঝ্‌তে পেরেছে, আর বনবিহারী পান্নার কাছে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেও এতদিন তার ছদ্মবেশ ধর্‌তে পারে নি; ধীরা পান্না

সম্বন্ধে নিজের ধারণা থেকেই হয়'ত এই অনুমান করে' নিয়েছে যে আমিও পান্নার স্বরূপ জেনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছি; এই জন্যেই ধীরা হয় ত আমার উপর বিরূপ ও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। আমি তার কাছে গিয়ে সব কথা অকপটে খুলে বলে' তার ক্ষমা চাইব, আর মদনও যে কি রকমের লোক তা তাকে বলে" সাবধান করে' দিতে হবে······

বনবিহারী জান্‌ত কিশোরের শয্যাপার্শ্বে গেলেই সে ধীরাকে দেখ্‌তে পাবে; সে দমকা হাওয়ার মতন কিশোরের ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল—সে দেখ্‌লে কিশোরের অন্তিমকাল উপস্থিত, তার শিয়রে পিতা ও পদতলে মাতা বসে' নীরবে অশ্রু বর্ষণ কর্‌ছেন, সেখানে ধীরা নেই, নীরাও নেই। বনবিহারী এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতের ন্যায় চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে ছুটে' কিশোরের কাছে গেল এবং দুই হাতে কিশোরের দুই হাত তুলে' নিয়ে নাড়ী দেখে আবার দুই হাত বিছানার উপর রেখে দিলে; তার পর ত্বরিত গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের তাক থেকে একটা ওষুধ কয়েক ফোঁটা কাঁচের গেলাসে ঢেলে কিশোরকে খাইয়ে দিলে; তার পর সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল, একটি কথাও কারো সঙ্গে বল্‌লে না, ধীরাকেও তার খোঁজা হল না।

বনবিহারী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে নিজের বাড়ী গিয়ে কতকগুলো ওষুধ নিয়ে কিশোরের কাছে ফিরে এল এবং তৎপরতার সহিত সূচিকাভরণ একটা ঔষধ ইন্‌জেক্‌সন্ করে' উৎসুক পর্য্যাকুল দৃষ্টিতে মুমূর্ষু বালকের মুখের দিকে তাকিয়ে ঔষধের প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

*

* *

মূল্য ১৲ এক টাকা, বেশী দিবেন না।

মৃত্যুর গ্রাস থেকে কিশোরকে ছিনিয়ে নেবার জন্য বনবিহারী ডাক্তার যখন ব্যস্ত হয়ে ঔষধের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্‌ছিল, তখন কিশোরের দুই দিদির মধ্যে একজনও বাড়ীতে ছিল না, এবং দুজনের মনেই কিশোরের মৃত্যুর চিন্তার চেয়ে অপর চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

ধীরা যখন বসে' বসে' দেখ্‌ছিল যে তার ভাই ক্রমশঃই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন তার মনে হচ্ছিল বনবিহারী চিকিৎসা কর্‌লে এখনও হয় ত বা-একে ফেরাতে পারা যেত, তখন তার মনের মধ্যে দ্বিধার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হল—বনবিহারীর সুখ-মিলনে ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাকে পান্নার বাড়ী থেকে ডেকে আন্‌বে অথবা ছোট ভাইটিকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা না করে'ই তাকে মরে' যেতে দেবে?

চোখের সাম্‌নে ছোট ভাইটির মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখ্‌তে না পেরে এবং তার মনের দ্বিধার একটা সমাধান করে' নেবার জন্যে ধীরা উঠে পাশের ঘরে চলে' গেল; কিশোর ও পিতা-মাতার সাম্‌নে সে এতক্ষণ নিজের শোকোচ্ছ্বাস কোনো মতে দমন করে' বসে' ছিল, কিন্তু এখন নির্জ্জন নিরালায় এসে সে একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়্‌ল—এ কান্না কিশোরের জন্যে, বনবিহারীর জন্যে, এবং তার নিজের জন্যেও। সে মাটিতে বসে' নীরার বিছানার উপর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌ছিল, তার মনে হচ্ছিল যেন এই কান্না-স্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে তার হৃদয়ও উপ্‌ড়ে বেরিয়ে আস্‌বে। ধীরা কান্না রোধ কর্‌বার জন্যে বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজে বালিসের তলায় হাত চালিয়ে বিছানা আঁক্‌ড়ে ধরে' ক্রন্দন সংবরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে গেল,—তার হাত লেগে খাট থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়্‌ল একটা টিনের কৌটা এবং একটা কাগজ; টিন ও কাগজের পতন-শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ধীরা মুখ তুল্‌তেই দেখ্‌লে একটা নূতন সিগারেটের টিন। পতনের আঘাতে তার ডালা খুলে গেছে এবং

তার মধ্যে থেকে সিগারেট্ বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। নীরার বালিসের তলা থেকে সিগারেট্ বাহির হতে দেখে ধীরা এমন আশ্চর্য্য হয়ে গেল যে তার কান্না ভুলে সে তাড়াতাড়ি যেই সিগারেটের টিন তুলে নিতে হাত বাড়ালে; টিনের দিকে ঝুঁকেই তার দৃষ্টি পড়্‌ল টিনের কাছে পতিত কাগজখানার উপরে—সেটা একখানা চিঠি, মোড়কের উপরে নীরার হস্তাক্ষর লেখা আছে "দিদি"।

ধীরা তাড়াতাড়ি সেই চিঠি তুলে নিয়ে মোড়ক খুলে পড়্‌লে—নীরা লিখেছে—"দিদি, মদন-বাবু আজ চলে' যাচ্ছেন, আমিও তাঁর সঙ্গে চল্‌লাম। তুমি যখন এই চিঠি পাবে তখন আমি অনেক দূরে......

চিঠিতে আর কি লেখা আছে ধীরার তা দেখ্‌বার প্রবৃত্তিও হল না, অবসরও ছিল না, সে চিঠিখানা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে' উন্মত্তের মতন বাড়ী থেকে বেরিয়ে নদীর ঘাটের দিকে ছুটল; কিশোরের মৃত্যুশোকে সে ত বিহ্বল হয়েই ছিল, তার উপরে নীরার এই মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক ও শোকাবহ তিরোধান তাকে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় করে' তুল্‌ল, নীরার আচরণ পিতা-মাতার বক্ষে যে পুত্রশোকের অপেক্ষাও অধিকতর আঘাত কর্‌বে এই কথা ভেবে ধীরা আরো বেশী ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল।

নদীর ঘাটে গিয়ে ধীরা দেখ্‌লে মদনের ষ্টিমার তখনও চলে' যায় নি, কূল থেকে অল্প দূরে গভীর জলে নোঙর করে' আছে; বিদ্যুতের আলোয় ষ্টিমার উদ্ভাসিত হয়ে আছে, সেই আলো নদীর জলে পড়ে' স্রোতের উপর ঝিক্‌মিক্ কর্‌ছে। ষ্টিমারে আলোর সমারোহ দেখে আলোর ভয়ে পলাতক সমস্ত অন্ধকার যেন ছুটে এসে ধীরার অন্তরে জড়ো হল; তার মনে হল নীরাকে উপভোগের উৎসবেই ষ্টিমারে এত আলোর প্রমত্ত আতিশয্য! ধীরার চীৎকার করে কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল, বক্ষবিদারণ চীৎকারে নীরার

নাম ধরে' ডাকৃতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু যে কথা সে নিজের মনে ভাবতেও লজ্জাবোধ করছিল সেই অতি গোপনীয় লজ্জার কথা লোকের কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়বার ভয়ে সে মর্ম্মন্তুদ বেদনা অন্তরেই গোপন রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। বিলাপ করবার তার তখন অবসর ছিল না; এতক্ষণ হয়ত কিশোরের প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, তার অন্তিম সময়ে সে হয়ত দিদিদের খুঁজেছে, তার খোঁজে পিতামাতাও হয় ত তাদের খুঁজেছেন, এই সর্ব্বনাশের শোকের সময় তারা নিকটে থাকলে পিতা-মাতা অনেকখানি সান্ত্বনা পেতে পারতেন; যত শীঘ্র হয় এখন ফিরতে পারলেও হত; কিন্তু নীরাকে না নিয়ে সে ফিরে যাবেই বা কেমন করে? নীরাকে ফিরিয়ে আনবার উপায়ই বা কি তাও ত সে ভেবে কিছুই স্থির করতে পারছিল না। ঘাটে কোনো নৌকা নেই, ষ্টিমারের জলিবোটটা ষ্টিমারের পাশে সিঁড়ির রেলিঙে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে, জলস্রোতে সেখানা ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে। নদীতীর থেকে ষ্টিমারে যাবার কোনও উপায় না দেখে ধীরার মন ব্যাকুলতার মধ্যেও একবার ক্ষণিক আনন্দ অনুভব করলে—কূল থেকে বিচ্ছিন্ন দুর্গম ষ্টিমারে নীরাও তা হলে যেতে পারে নি! কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল হয় ত নীরার সঙ্গে মদনের গোপন পরামর্শ স্থির ছিল, নীরাকে তীর থেকে তুলে' নিয়ে যাবার জন্যে মদনের লোকেরা বোট নিয়ে হয়ত কূলে অপেক্ষা করছিল এবং নীরা এলে তারা তাকে ষ্টিমারে নিয়ে গেছে। এই আশঙ্কা মনে জাগ্রত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ধীরার মনে পড়ল মদন বরাবর নীরাকে উপেক্ষা ও অবহেলাই করে' এসেছে, এবং মদনের সমস্ত মনোযোগ ও আগ্রহ তাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থেকেছে; মদনের এইসব আচরণ কি তবে মিথ্যা ছলনা মাত্র, নীরা সম্বন্ধে তার দুরভিসন্ধি কেউ যাতে সন্দেহও না করতে পারে তার জন্যে কি তার এই বিপরীত ব্যবহার।

এই কথা মনে হতেই ধীরার বুক কেঁপে উঠ্‌ল, মদনের পাকা সয়তানীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে ধীরা বিস্ময়বিহ্বল হয়ে উঠ্‌ল। ধীরা কল্পনায় দেখ্‌তে লাগ্‌ল মদন ও নীরা পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি করে' বসে' তার মূঢ়তা নিয়ে হাসাহাসি কর্‌ছে, তাকে যে তারা কি রকম ঠকিয়েছে এই কথা বলাবলি কর্‌তে কর্‌তে নীরা হেসে কুটিকুটি হয়ে মদনের গায়ে গড়িয়ে পড়্‌ছে। কল্পনায় এই দৃশ্য ধীরার মনে উদিত হতেই ধীরার দুর্দ্দম ইচ্ছা হল সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে' সাঁতরে ষ্টিমারে গিয়ে নীরাকে মদনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' ছিনিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু সে ত পশ্চিমের মেয়ে, কূপের তোলা-জলের সঙ্গেই মাত্র তার পরিচয়, সে ত সাঁতার জানে না।

ধীরা যখন ডাঙায়-তোলা কই মাছের মতন জলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার জন্যে ছটফট কর্‌ছে তখন দেখ্‌লে অনাথ কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত বারম্বার পিছন ফিরে-ফিরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে নদীর উপরের রাস্তা দিয়ে ছুটে' চলেছে। অনাথকে দেখে ধীরার মুমূর্ষু শরীর ও মন তৎক্ষণাৎ প্রাণ পেয়ে যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠ্‌ল, সে চীৎকার করে' অনাথকে ডাক্‌তে গিয়েই উদ্‌গত স্বর সম্বরণ করে' নিলে এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে অনাথের দিকে ছুটে চল্‌ল।

অনাথ পিছনে লোক দৌড়ে আসার শব্দ শুনেই ভয়চকিত হয়ে চারি দিকে একবার সন্ত্রস্ত দৃষ্টিপাত করে'ই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগ্‌ল। অনাথের ক্ষিপ্রপদের দ্রুতগতির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ধীরা ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়্‌ছিল; দারুণ বিপদের একমাত্র সহায় অনাথও অদৃশ্য হয়ে যায় দেখে ধীরা কাতর ও ব্যাকুল স্বরে চাপা গলায় বলে' উঠ্‌ল—ও অনাথ, দাঁড়া ভাই, বড় বিপদ্‌......

ধীরা হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা-কান্নার সমুদ্রের ভিতর থেকে ছেঁকে তুলে যে কটি কথা বল্‌তে পার্‌লে তাই অনাথের কানে গিয়ে এমন করুণ ভাবে

বাজ্‌ল যে সে তৎক্ষণাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে? বড় দিদি?·কিশোর ভালো আছে ত?······

অথই জলে মজ্জমান ব্যক্তি হাতের সাম্‌নে কোনো আশ্রয় পেলে সেটা যেমন আগ্রহভরে চেপে ধরে' ধীরা ছুটে এসে তেমনি আবেগভরে অনাথের হাত চেপে ধরে' থর্‌থর করে' কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, সে ভয়ে উদ্বেগে ও পরিশ্রমে এমন হাঁপাচ্ছিল যে আর একটি কথাও বল্‌তে পার্‌লে না।

অনাথ ধীরার এই-রকম উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা দেখে শঙ্কিত ও চিন্তিত হয়ে বল্‌লে—দিদি, তুমি বড্ড কাঁপ্‌ছ, একটু এখানে বস্‌বে?—আমার জামাটা খুলে' পেতে দি, তুমি এইখানে একটু বস।

অনাথের স্নেহের স্পর্শে ধীরার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল, সে উচ্ছ্বসিত কান্না রোধ কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—বস্‌বার এখন সময় নেই ভাই, বস্‌বার সময় নেই···বড় বিপদ্‌···তুমি আমার সঙ্গে শীগ্‌গির এস······

ধীরা অনাথের হাত ধরে' তাকে টান্‌তে টান্‌তে নদীর দিকে ছুটে চল্‌ল—পাছে সে এই একটি মাত্র উপায়ও হারায় এই ভয়ে অনাথের হাত ছেড়ে দিতে পার্‌ছিল না।

ধীরাকে নদীর দিকে যেতে দেখে' অনাথ মনে কর্‌লে—কিশোরের হয় ত মৃত্যু হয়েছে, তাকে নদী-তীরে দাহ কর্‌তে আনা হয়েছে, দাহকর্ম্মের কোনো অভাব বা ব্যাঘাত ঘটেছে বলে'ই ধীরা তাকে নদীর দিকে নিয়ে চলেছে। কিন্তু অনাথ যে নীরার হুকুমে তার মনিবের দোকানের তহবিল ভেঙে টাকা নিয়ে নীরাকে দিতে যাচ্ছিল, ধীরার হাতে গেরেপ্তার হয়ে নীরাকে তার টাকাও দেওয়া হবে না, আর তার চুরিও হাতে-হাতে ধরা পড়ে' যাবে। এই আশঙ্কায় ও কৌতূহলে ব্যস্ত হয়ে অনাথ ধীরাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—নদীর দিকে যাচ্ছ কেন বড় দিদি?

ধীরা বাদল-দিনের উতলা বাতাসে পল্লব-মর্ম্মরের মতন ফিস্‌ফিস্‌ করে' বল্‌লে—চুপ! এখানে কোনো কথা নয়…কেউ শুন্‌তে পাবে……

কেউ দেখ্‌তে পাবার ভয়ে অনাথ ছুটে পালাচ্ছিল, কেউ শুন্‌তে পাবার ভয়ে ভীত ধীরা এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়ে রহস্য আরো ঘনীভূত করে' তোলাতে অনাথের ভয় আরো প্রবল হয়ে উঠ্‌ল—অনিশ্চিত আশঙ্কায় তার বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল।

নদীর কূলে পৌঁছে চারি দিকে তাকিয়ে কিছুই না দেখে অনাথ ব্যাকুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ধীরার মুখের দিকে চাইলে।

ধীরা হাঁপাতে হাঁপাতে অস্ফুট মর্ম্মর স্বরে বল্‌লে—নীরা মদন-বাবুর সঙ্গে কল্‌কাতায় পালিয়ে যাচ্ছে……

এইটুকু পর্য্যন্ত শোন্‌বা মাত্রই অনাথের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ল কেন নীরা তার কাছে থেকে সিগারেট্‌ আর টাকা চেয়েছিল। সে ধীরার কাছ থেকে আর কিছু শোন্‌বার অপেক্ষা না করে' ধীরার হাতে এক থলি টাকা দিয়ে বল্‌লে—এটা ধরো, এতে দোকানের টাকা আছে…

ধীরা অনাথের হাত থেকে টাকার থলি নেবা মাত্র অনাথ গায়ের জামাটা খুলে' মাটিতে ফেলে দিলে এবং ক্ষিপ্র হস্তে মালকোঁচা মেরে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

*

* *

নীরা অনাথকে টাকা আনতে পাঠিয়ে দিয়ে তার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে' প্রতীক্ষা করে' থাকতে পারে নি; অনাথের ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ব্যস্ত হয়ে নীরা বাড়ী থেকে গোপনে সন্তর্পণে বরাবর ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছিল; ঘাটে এসে সে দেখলে মদনের খানসামা মধু বাজার করে' নিয়ে বোটে চড়ে' ষ্টিমারে ফিরছে। নীরা দৌড়ে নদীর ধারে এসে লজ্জা ভয় ও আবেগ কম্পিত অস্ফুট স্বরে ডেকে উঠল—মধু, আমাকে ষ্টিমারে নিয়ে চলো।

বোট তখন কূল ছেড়ে জলে কিছু দূর ভেসে গিয়েছিল, মধু নীরার ডাক শুনে' মুখ ফিরিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে কূলে দাঁড়িয়ে আছে একাকিনী নীরা! নীরাকে দেখেই মধুর মনে হল এই সুন্দরী কিশোরীকে লাভ করবার জন্যে তার প্রভু তার কাছে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি এদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করেছেন। এই কথা মনে হতেই মধুর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল, সে কল্পনায় প্রভুর কাছ থেকে লোভনীয় পুরস্কার ও প্রসাদ লাভ করেছে ভেবে আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে উঠল। সে খালাসীদের বোট ফিরিয়ে তীরে ভিড়াতে বললে, এবং নীরাকে বোটে তুলে' নিয়ে ষ্টিমারে গেল। ষ্টিমারে উঠে মধু নীরাকে বললে—বাবু কামরার ভিতরে আছেন; আপনি যাবেন, না আমি খবর দেবো?

নীরা বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে—তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জন কয়েক খালাসী, তাদের মুখে বিদ্রূপ, চোখে কৌতুক ও লালসা; এই দেখে নীরার মনে হল সেখানকার বাতাস যেন কলুষের লজ্জায় ভরাট জমাট হয়ে উঠেছে, সে বাতাস এমন ঘন ও ভারী যে সে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারছে না; ভয়ে ও লজ্জায় তার

সমস্ত দেহ ও মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ল, সে একবার পিছন ফিরে দেখ্‌লে ডাঙা থেকে সে অনেক দূরে প্রায় মাঝ-দরিয়ায় এসে পড়েছে, সহজে ফিরে যাবার পথ তার সাম্‌নে নেই; মধু তার প্রভুকে তার আগমন-সংবাদ দিতে গেলে এই-সব বর্ব্বরদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে, এই সম্ভাবনাতেই নীরার বুক লজ্জায় ও ভয়ে কেঁপে উঠ্‌ল, সে অস্পষ্ট মৃদুস্বরে বল্‌লে—আমিই যাচ্ছি।

নীরা কম্পিত মন্থর-পদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কাম্‌রার ভিতরে গিয়ে প্রবেশ কর্‌লে।

মদন তখন শয্যায় অর্দ্ধশয়ান হয়ে' মাথার তলে দুই হাত রেখে নীরার কথা চিন্তা কর্‌ছিল। ঘরের মধ্যে লোক প্রবেশের পদশব্দ শুনে সে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু উন্মীলন করে' দরজার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে; নীরাকে লজ্জাকুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে মদন তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল এবং অবাক্ হয়ে নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে' রইল। বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত অতিক্রান্ত হলে মদন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—দিদি কই?

নীরা লজ্জাকুণ্ঠিত আবেগ-কম্পিত মৃদুস্বরে বল্‌লে—আমি একলা পালিয়ে এসেছি।

মদন রূঢ় দৃষ্টিতে নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন?

এই ছোট্ট প্রশ্নটি নীরার কানে বজ্রাঘাতের মতন ধ্বনিত হল, তার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে ও লজ্জায় একবার শিউরে উঠ্‌ল, সে কোনো মতে বাক্য উচ্চারণ করে' বল্‌লে—আমি আপনার সঙ্গে কল্‌কাতায় পালিয়ে যাব……

মদন আবার একটি মাত্র বাক্যে প্রশ্ন কর্‌লে—কেন?

এই প্রশ্নে নীরার যেন একেবারে মাথা কাটা গেল, সে এক ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচত, কিন্তু পালাবার পথ ত সে রেখে আসে নি, তাই সে নিরাশার শেষ অবলম্বন সাহস সঞ্চয় করে' অস্ফুটস্বরে বললে—আপনাকে আমি ভালবাসি······

এই কথা উচ্চারিত হবা মাত্রই নীরার নিজের কথাই তার নিজের কানে এমন কুৎসিৎ ভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠল যে তার ইচ্ছা হতে লাগল এক ছুটে বাইরে গিয়ে গুঞ্জরী নদীর অতল জলে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে এই দারুণ অপমানের লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে।

বেপথুমতী নীরার দিকে নিষ্করুণ তীব্র রূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মদন বলতে লাগল—তুমি আমাকে ভালোবেসেছ, না আমার এই অন্তঃসারশূন্য বাহিরে চটকদার এই চেহারাখানা আর আমার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরকে ভালোবেসেছ? পুরুষ শিকারী-জানোয়ার, দুঃখ—সহ্য করে' পলাতকাকে বন্দী করতে ও জয় করতে পারাতেই তার আনন্দ! আপনি এসে ধরা দিতে ব্যগ্র, গায়ে-পড়া মেয়েমানুষকে আমার মতন নির্ব্বিচারী লম্পটও গ্রহণযোগ্য মনে করে না—তা তার রূপ ও যৌবন যতই পরিপূর্ণ থাকুক না কেন। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি যে জলধর-বাবুর মেয়ে আর ধীরার বোন হয়ে তোমার এমন নীচ হীন প্রবৃত্তি কেমন করে' হল! তুমি যদি ধীরার বোন না হতে তা হলে তোমাকে আমার ষ্টীমারের খালাসীদের বকশিশ করে' দিতাম। তোমার ত অপমানের ভয় নেই, কিন্তু ধীরার অপমান হবে বলে' আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। ভালোয় ভালোয় বাড়ী ফিরে যাও······

স্ত্রীলোকের পক্ষে নিজের মুখে প্রণয়-নিবেদন করে' আত্মদান করাই ত বিষম কঠিন লজ্জার বিষয়, তার উপর যদি প্রত্যাখ্যাত হতে হয় তবে

সে ত মরণাধিক ভয়ঙ্কর। নীরা কাঁপ্তে কাঁপ্তে সেইখানে বসে' পড়ে' মেঝেতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগ্ল।

মদন নীরার দুরবস্থার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে' ডাক্লে মধু......

মধু কাম্রার বাহিরেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে প্রভুর সব কথাই শুনে মনে মনে হাস্‌ছিল; প্রভুর আহ্বান শোন্‌বা মাত্র সে এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

মধুকে দেখেই মদন আদেশ কর্‌লে—এই ছুঁড়ীকে ডাঙায় নামিয়ে দিয়ে আয়গে।

তার পর নীরাকে বল্‌লে—নাও, এখন ওঠ, বেশী লোক টের পাবার আগে বাড়ী ফিরে যাও, বাড়ী গিয়ে যত ইচ্ছে হয় কেঁদো। আমাদের কারো তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার বাড়ীতে পৌছে দেওয়া ঠিক হবে না, তুমি একলাই ফিরে যেও...শীগ্‌গির ওঠ, যত দেরী কর্‌বে লজ্জা আর অপমান তত বাড়্‌বে।

নীরা জড়সড় হয়ে নতমুখে উঠে' দাঁড়াল এবং কম্পিত-পদে মধুর পিছনে পিছনে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে' গেল।

ষ্টিমার থেকে বোটে নাম্‌বার সিঁড়ির কাছে গিয়ে মধু নীরার দিকে ফিরে মুচ্‌কি হেসে রঙ্গভরা মৃদু স্বরে বল্‌লে—বাবু ত তোমাকে আমাদের বক্‌শিশ করে দিয়েছেন। আমাদের কাছেই থেকে যাও না চাঁদ!

ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে অনুতাপে নীরার বুক ফেটে কান্না উথ্‌লে উঠ্‌তে চাচ্ছিল, কিন্তু তখনই তার মনে হল এখানে ক্রন্দন বৃথা, কারো কাছে তার সহানুভূতি বা সাহায্য পাবার আশা অল্পই। সে মনে মনে অগতির গতি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় লজ্জানিবারণ পরমেশ্বরের শরণ প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌ল—তার ইচ্ছা হতে লাগ্‌ল তার বাবা মা দিদি তার লাবণ্যের

rupoton

নীবার প্রসাধন-পারিপাট্য (৯৫ পৃষ্ঠা)

বার্ত্তা টের পেয়ে এইখানে এসে পড়ুক এবং তাকে এই মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করে' নিয়ে যাক্, তার পর তাঁরা তাকে যে শাস্তি দেবেন তা সে অম্লান বদনে অনায়াসেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে—এই দুঃসহ অপমানের তুলনায় তাঁদের রূঢ়তম ও কঠিনতম শাস্তিও লঘু ও সহনীয় মনে হবে।

নীরাকে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা কর্‌তে দেখে মধু ব্যঙ্গভরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি ভাব্‌ছ সোনামণি? আমার কাছেই থেকে যাবে না কি?

নীরা হতাশার শেষ অবলম্বন বাহ্যিক সাহস দেখিয়ে রূঢ় স্বরে বলে' উঠ্‌ল—খবরদার্ বেয়াদব! ফের যদি একটা কথা বল্‌বে ত তোমার বাবুকে বলে' জুতো খাওয়াব। বাবু যা হুকুম করেছেন তাই করো, আমাকে ডাঙায় পৌঁছিয়ে দিয়ে এস।

প্রভুকে উপযাচিকা নীরার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ কর্‌তে শুনে মধুর মনে যে দুঃসাহস জন্মেছিল, নীরার সাহস দেখে ও ভর্ৎসনা শুনে সে সাহস তার তিরোহিত হয়ে গেল, কারণ তখনই তার মনে হয়ে গেল নীরা ধীরার বোন, এর অপমান প্রভু হয় ত বর্‌দাস্ত করতে পার্‌বেন না। তবু সে মৌখিক রসিকতা করে' বল্‌লে—ইস! গরীব বলে' একদম গর্‌রাজি! চলো তবে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নীরা নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেলে বোটে নেমে গেল, তার পিছনে পিছনে মধুও নাম্‌ল। দুজন খালাসী বোট বেয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সিঁড়িতে নাম্‌তে যাচ্ছিল, মধু দাঁড়ের ঠেলা দিয়ে নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে বল্‌লে—তোমাদের আস্‌তে হবে না, আমি একাই পৌঁছে দিয়ে আস্‌ছি।

খালাসীরা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—যা, ভাই, যা, তোরই দিল পুরা হোক।

মধু দাঁড় বাইতে বাইতে খালাসীদের দিকে তাকিয়ে দন্তবিকাশ করে' হাস্‌লে।

অল্প দূর এগিয়ে গিয়েই মধু দাঁড় তুলে রেখে চুপ করে' বস্‌ল।

মধু একা আসাতেই নীরার বুক ভয়ে টিপ্‌টিপ্‌ কর্‌ছিল, এখন তাকে চুপ করে' বস্‌তে দেখে ভয়ে ভাবনায় কাতর হয়ে নীরা মিনতির স্বরে মধুকে বল্‌লে তোমার ছুটি পায়ে পড়ি মধু—আমাকে শীগ্‌গির ডাঙায় নামিয়ে দাও......

মধু হেসে বল্‌লে—দাঁড়াও চাঁদ, তোমার পালিয়ে আসা আগে গাঁ-ময় রাষ্ট হোক্, গাঁয়ের লোকেরা এসে দেখুক তুমি আমার সঙ্গে জল-বিহার কর্‌ছ, তবে ত......

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে মধু উঠে গিয়ে নীরার একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

নীরা ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে কোনোমতে বল্‌লে—তুমি আমার গায়ে হাত দিলে আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ব......

মধু টপ্‌ করে' ছহাতে নীরাকে জড়িয়ে ধরে' বল্‌লে—আমার প্রেম-নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড় চাঁদ......

নীরা মধুর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত কর্‌বার অথবা প্রতিবাদের একটি কথাও উচ্চারণ কর্‌বার আগেই নীরা অনুভব কর্‌লে তার শরীর থেকে মধুর বহুবন্ধন হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তার কাছ থেকে মধু একেবারে ছিটুকে সরে' গেল, সঙ্গে-সঙ্গে জলে একটা ভারী বস্তু পতনের ঝপাৎ করে' শব্দ হল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গেই মধু আবার ফিরে এসে তার পাশে দাঁড়াল! এ কী ভৌতিক ব্যাপার ভালো করে' বোঝ্‌বার জন্যে নীরা চোখ মেলে তাকাতেই দেখ্‌তে পেলে তার পাশে মধু নেই, তার

পাশে দাঁড়িয়ে আছে সিক্তশরীর অনাথ, নৌকা থেকে কার কুহকমন্ত্রে মধু তিরোহিত হয়ে অনাথের আবির্ভাব হয়েছে! অনাথকে দেখেই নীরা যেন মৃত দেহে প্রাণ পেলে, সে পরম আগ্রহে দুই হাত দিয়ে অনাথের সিক্ত শরীর জড়িয়ে ধরে' আনন্দে আশায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্‌লে—অনাথ, তুমি আমাকে শীগ্‌গির বাড়ীতে নিয়ে চলো।

মূর্ত্তিমান্ আশ্বাসের মতন অনাথ বাঁ হাতে নীরাকে বেষ্টন করে' ধরে' ডান-হাতে একটা দাঁড় তুলে ধরে' জলের উপর আস্ফালন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে—নৌকার কাছে এসেছ কি এই দাঁড় দিয়ে তোমার মাথা ভেঙে দেবো।

অনাথ যে দিকে চেয়ে দাঁড় আস্ফালন কর্‌লে, নীরা কৌতূহলী হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে জলের উপর মধুর মুণ্ড ভাস্‌ছে।

মধু কাতর স্বরে অনাথকে বল্‌লে—তুমি যে ঘুসি মেরেছ অনাথ-বাবু, আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ কর্‌ছে, আমাকে নৌকায় তুলে' না নিলে আমি ডুবে মর্‌ব……

অনাথ অবিচলিত অটল ভাবে বল্‌লে—তুমি ডুবে নরকে তলিয়ে গেলেও তোমাকে তুল্‌ব না।

অনাথ আবেগকম্পিতা নীরাকে ধীরে ধীরে নৌকার বাতার উপর বসিয়ে দিয়ে দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে' জোরে ঝিঁকা মেরে ডাঙার দিকে নৌকা বেয়ে চল্‌ল।

নদীর ধারে অন্ধকারে ধীরা একাকিনী অনাথের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা কর্‌ছিল, এক এক মুহূর্ত্ত তার কাছে এক এক শতাব্দীর মতন মনে হচ্ছিল; অনাথ জলে পড়্‌তে না পড়্‌তে তার মনে হচ্ছিল অনাথ অনেকক্ষণ গেছে, এখনও সে ফির্‌ছে না কেন। অন্ধকারে সে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিল না, অনাথ ষ্টিমারে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাতে পার্‌লে কি না, সেখানে নীরাকে পেলে কি না, এবং নীরাকে দেখ্‌তে পেলেও একলা ছেলেমানুষ অনাথ মদনের জনবলবেষ্টিত ব্যূহের মধ্য থেকে নীরাকে উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে কি না, উদ্ধার কর্‌তে পার্‌লেও মাঝনদী থেকে সন্তরণে অপটু নীরাকে সে কেমন করে' তীরে উত্তীর্ণ করে' আন্‌বে,—এই-সব অনিশ্চয়তার উদ্বেগে ধীরা অত্যন্ত পর্য্যাকুল হয়ে উঠেছিল, সে চক্ষু যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে' নদীর উপর অন্ধকারের ভিতর দৃষ্টি প্রেরণ করে' অনাথের গতিবিধি আবিষ্কার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল। তার সমস্ত মনোযোগ নদীর বুকের অন্ধকারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে তার বাহ্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ বিদ্যুৎবিকাশের মতন তীব্রোজ্জ্বল এক ঝলক্ আলোক ধীরার মুখের উপর এসে পড়াতে ধীরা চম্‌কে উঠে ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্যে মুখ ফিরালে, অম্‌নি স্নেহ-মধুর সম্ভাষণে তার শ্রবণ জুড়িয়ে গেল—এত রাত্রে এখানে একলা কি কর্‌ছ মা?

এ স্বর মতি বেনের। মতি বেনে দোকান বন্ধ কর্‌তে গিয়ে দেখ্‌লে তার তহবিলের থলি অন্তর্ধান করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অনাথও। সে তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে' গাঁময় অনাথকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কোথাও অনাথের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রামের মধ্যে কোথাও অনাথের সন্ধান না পেয়ে মতি বেনে গ্রামের বাইরে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছে;

পাছে দূর থেকে আলো দেখে বা পায়ের শব্দ শুনে অনাথ ভেগে যায় এই ভয়ে মতি বেনে খালি পায়ে লণ্ঠন না নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিন্তু আবশ্যক হলেই আলো জ্বেলে দেখ্‌তে পারবে বলে' সে দোকান থেকে একটা কলটেপা বিদ্যুৎ-বাতি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। নদীর ধারে এসে কিছু দূর থেকে সে যখন দেখ্‌তে পেলে একজন কেউ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তখন সেই ব্যক্তিই অনাথ এই অনুমান করে' সে পা টিপে টিপে সন্তর্পণে কাছে এসে তার মুখের উপর হঠাৎ বিদ্যুতের আলো ফেলেছিল; কিন্তু অনাথের পরিবর্ত্তে এত রাত্রে এই বিজন নদীতীরে একাকিনী ধীরাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মতি বেনের বিস্ময়ের অবধি রইল না। তার পর দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে যখন সে দেখ্‌লে তার দোকানের অপহৃত টাকার থলি ধীরার হাতে রয়েছে তখন তার বিস্ময় সকল সীমা অতিক্রম করে' গেল।

মতি বেনে ধীরাকে অত্যন্ত স্নেহ করত এবং ধীরাও তাকে ভালোবাস্‌ত। চরম দুঃখের ও সংশয়ের সময় সেই স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধের কোমল সম্ভাষণে ধীরার রুদ্ধ বেদনা ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই নীরার পলায়ন-ব্যাপার অপরের কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়্‌বার ভয়ে সে তাড়াতাড়ি আঁচল তুলে চোখ মুছ্‌তে লাগ্‌ল। তার হাতের মুঠোয় যে নীরার চিঠি ছিল এ কথা সে ভুলেই গিয়েছিল, তার হাত থেকে সেই চিঠি খসে' ঠিক্‌রে গিয়ে মতি বেনের পায়ের কাছে পড়্‌ল, ধীরা টেরও পেলে না।

পায়ের কাছে কি পড়্‌ল দেখ্‌বার জন্যে মতি বেনে কাগজখানা তুলে নিয়ে বিদ্যুৎ-বাতির আলোতে ধরে' দেখ্‌লে একখানা চিঠি। সে পাড়াগেঁয়ে সেকেলে মানুষ, পরের চিঠি পড়া উচিত কি না এ সম্বন্ধে কিছু

মাত্র দ্বিধা বিতর্ক না করে' চিঠিখানা পড়ে' গেল। তার পর এক মুহূর্ত্ত অবাক্ হয়ে ধীরার দিকে তাকিয়ে থেকে সে বললে—মা ধীরা, তুমি শান্ত হও, আমি সাঁতরে গিয়ে ষ্টিমার থেকে এখুনি নিরুকে নিয়ে আসছি......

মতির এই কথা শুনে ধীরা আশ্চর্য্য হয়ে আর ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে মতির দিকে তাকালে—তা হলে কি গাঁময় নীরার পলায়নবার্ত্তা রাষ্ট হয়ে গেছে? মতির দিকে তাকিয়েই ধীরা দেখ্‌লে তার হাতে নীরার চিঠি রয়েছে। ধীরা নিজের অসাবধানতায় বিরক্ত ও লজ্জিত হয়ে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে মতির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে যে কি বল্‌বে কি কর্‌বে তার কিছুই ঠিক করতে পারছিল না।

কিন্তু তাকে আশ্বস্ত করে' তখনই মতি বেনে বললে—তোমার কোনো ভয় নেই মা, গাঁয়ের চতুর্থ প্রাণী জান্‌বার আগে আমি নীরাকে ফিরিয়ে এনে তোমার কাছে দিচ্ছি। কী বলব যে এ কথা প্রকাশ কর্‌বার নয়, নইলে ঐ শয়তানটাকে তার ষ্টিমার সুদ্ধ গুঞ্জরীর জলে গুঁজ্‌ড়ে রেখে আস্‌তাম।

মতি বেনে গায়ের জামা খুলে কাপড় গুটিয়ে নিয়ে জলে নাম্‌বার উপক্রম করছে, ধীরা দুই চোখে কৃতজ্ঞতা ভরে' নিয়ে বৃদ্ধের আগ্রহ লক্ষ্য কর্‌ছে, এমন সময় নদীর জলের উপর ঝপাং করে' গুরু বস্তু পতনের শব্দ শুনে দুজনেই চম্‌কে উঠ্‌ল, এবং অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করে' ব্যাপার কি দেখ্‌বার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল; দুজনেরই মনে একসঙ্গে এই আশঙ্কা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল যে হয় তু বা অনাথকেই মদনের লোকেরা মেরে জলে ফেলে দিলে। মতি বেনে নিজের মনের সন্দেহ ও আশঙ্কা-কেই যেন আশ্বাস ও সাহস দিয়ে ধীরাকে বলে' উঠ্‌ল—কিছু ভয় কোরো না মা, আমি এক্ষণি গিয়ে দেখ্‌ছি কি হল......

মতি বেনে আবার জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে এমন সময় ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড় বাওয়ার শব্দ কানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে চোখের সাম্‌নেও প্রকাশিত হয়ে উঠ্‌ল ষ্টিমারের সাদা রঙের জলি-বোটখানা শন্‌ শন্‌ করে' ডাঙার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

নৌকাতে কে আছে দেখে নেবার জন্যে মতি বেনে তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠে মাটি থেকে বিদ্যুৎ-মশালটা তুলে' নিয়ে তার চাবি টিপে উজ্জ্বল আলোর হঠাৎ ঝলক নৌকার উপর ফেল্‌তেই দেখ্‌লে—দুহাতে শক্ত করে' নৌকার বাতা ধরে' বসে' আছে বিবর্ণবদনা বিবশশরীরা বিহ্বলচিত্তা নীরা, আর দুই হাতে দাঁড় ধরে' একেবারে চিতিয়ে পড়ে' নৌকা বেয়ে আস্‌ছে ঘর্ম্মাপ্লুতকলেবর অনাথ! আনন্দের আতিশয্যে বৃদ্ধের লাফিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে ইচ্ছা হল, কিন্তু তৎক্ষণাৎই সে সেই ইচ্ছা দমন করে' ফেল্‌লে—এ আনন্দ ত চোরের মায়ের কান্নার মতন, একে সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের কাছ থেকে গোপন করে' রাখ্‌তে হবে।

বিদ্যুৎ-আলোর হঠাৎ ঝলক নৌকার উপর এসে পড়্‌তেই নীরা আর অনাথ দু'জনেই চম্‌কে উঠ্‌ল—দুজনেরই ভয় হল ডাঙাতেও কি মদনের চরেরা তাদের আটক করে' রাখ্‌বার জন্যে ঘাটা আগ্‌লে আছে? আর যদি মদনের লোক নাও থাকে, ধীরা ছাড়া অন্য কেউ ত নিশ্চয়ই আছে তার সামনে এই গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ হয়ে পড়্‌বার ভয়ে ও লজ্জায় নীরা ও অনাথ দুজনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠ্‌ল, নীরা তার বিবর্ণ মুখ অবনত করে' বস্‌ল, আর অনাথের হাত শিথিল হয়ে দাঁড় বাওয়া থেকে ক্ষান্ত হল। এখন যে কী করা উচিত অনাথ তা ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না।

অনাথকে দাঁড় বাওয়া থেকে ক্ষান্ত হতে দেখে ধীরা অনাথের দ্বিধা

বুঝ্‌তে পেরে ভাবাবেগে-বিকম্পিত কণ্ঠে অভয় দিয়ে ডেকে বল্‌লে—অনাথ ভাই, তুমি এসো, এখানে মতি-জেঠা ছাড়া আর কেউ নেই।

ধীরার এই কথা অনাথের কাছে কিছুমাত্র অভয়সূচক মনে হল না—মতি বেনের সম্মুখে উপস্থিত হতে ভয়ে ও লজ্জায় তার মাথা কাটা যেতে লাগ্‌ল—মতি বেনে নিশ্চয়ই তার চোরাই মালের সন্ধানে তাকে গেরেপ্তার কর্‌বার জন্যে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এই নদীর ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছে। অনাথের ইচ্ছা হতে লাগ্‌ল সে নীরাকে মাঝনদীতে নৌকার উপর একলা ফেলে রেখে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এবং জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে পরপারে যেখানে হোক উঠে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

অনাথ নিজের দুর্ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে কতক্ষণ যে নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিল সে দিকে তার কিছুমাত্র হুঁশ ছিল না—হয় ত সে অনেকক্ষণই ইতস্ততঃ করছিল, হঠাৎ সে ধীরার পুনরাহ্বানে চম্‌কে উঠে শুন্‌লে—আর দেরী করিস নে ভাই, এখন এক মুহূর্ত্তও যে অপব্যয় কর্‌বার জো নেই……

ধীরার ব্যাকুলতায় নিজের কথা ভুলে' অনাথ আবার জোরে নৌকা বেয়ে কূলে এসে উত্তীর্ণ হল।

নৌকা ডাঙায় ভিড়িয়েই অনাথ নীরার হাত ধরে' ডাঙায় নামিয়ে আন্‌লে, নীরার হাতে হাত দিয়ে অনাথ মধুর আবেশের অনির্ব্বচনীয় আনন্দের মধ্যেও বুঝ্‌তে পার্‌লে নীরা বাতাহত বেতসলতার ন্যায় থর্‌থর্‌ করে' কাঁপ্‌ছে।

ডাঙায় পা দিয়েই নীরা কম্পিত পদে ছুটে গিয়ে দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল; দুঃখ-সুখের মিশ্র আবেগের অভিঘাতে ধীরার চোখ দিয়েও দরদর'ধারে জল গড়িয়ে পড়্‌ল, ধীরা ক্রন্দন-কম্পিত স্বরে বল্‌লে—শীগ্‌গির বাড়ী ফিরে চল, এতক্ষণ কিশোর হয় ত আমাদের

একেবারে ছেড়ে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আন্‌বার কোনো উপায়ই নেই……

ধীরা সস্নেহে ভগিনীকে বুকের কাছে আবেষ্টন করে' ধরে' বাড়ীর দিকে যেতে যেতে বল্‌লে—অনাথ, তোমাদের দোকানের তহবিলের থলিটা নিয়ে যাও।

অনাথ ফ্যাকাশে মুখে মতি বেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বল্‌লে—আমি তহবিলের টাকা চুরি করে' পালিয়ে যাব বলে' মদন-বাবুর ষ্টিমারে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম; নীরা জান্‌তে পেরে আমাকে ফিরিয়ে আন্‌তে গিয়েছিল।

অনাথের কথা শুনে খুশী হয়ে মতি বেনে অনাথের কাঁধের উপর হাত রেখে বল্‌লে—বেশ বাবা, বেশ! এত রাত্রে ষ্টিমার থেকে তোমাদের ফিরে আসার কৈফিয়ৎ যদি কাউকে কখনো দিতে হয় তবে এই সুন্দর মিথ্যা কথাই এই-রকম সাহস করে' বোলো। তোমার কত টাকার দরকার হয়েছিল আমায় বলো আমি তোমায় দেবো।

অনাথ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সকল গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে বলে' উঠ্‌ল —আমার আর টাকার দরকার নেই…এমন কাজ আমি আর কখনো কর্‌ব না…আপনি আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন না, আপনি পুলিসে ধরিয়ে দিন, চুরির কথা আমি নিজেই স্বীকার কর্‌ব……

অনাথের এত অধিক আনন্দ হয়েছিল যে সে আজ কঠিনতম দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করে' নিতে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল।

মতি বেনে অনাথের কাঁধ চেপে ধরে' স্নেহভরে নাড়া দিয়ে বল্‌লে— আজ তুই যে কাজ করেছিস্ ছোঁড়া, তার শাস্তি আমি তোকে নিজে দেবো, তার জন্যে পুলিস ডাক্‌তে যাব না। আজ থেকে তুই আমার

দোকানের শূন্য-বখ্‌রাদার, আমার পুত্র-স্নেহের অর্দ্ধেক বখ্‌রাও তুই পাবি।

অনাথ আনন্দের আতিশয্যে কি যে করবে কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে মতি বেনেকে প্রণাম করে' তার পায়ের ধুলো নিলে।

মতি বেনে ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠ্‌ল—আরে আরে ছোঁড়া করিস কি—বামুনের ছেলে হয়ে পায়ে হাত দিচ্ছিস! যাঃ, ধীরু-নীরুকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আয়।

অনাথ ঝড়ের মুখে খড়ের কুটার মতন লঘু-পদে দৌড়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

নীরা মনে করেছিল দিদির কাছে না জানি তাকে কত ভর্ৎসনাই সহ্য কর্‌তে হবে; কিন্তু তার সেই আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হওয়াতে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল; তার দিদি যে একটি মাত্র কথা বলেছিল—"শীগ্‌গির বাড়ী ফিরে চলো, এতক্ষণে কিশোর হয়ত আমাদের একেবারে ছেড়ে গেছে, তাকে ফিরিয়ে আন্‌বার কোনো উপায়ই নেই"—তার মধ্যে যেটুকু ভর্ৎসনা প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল তার উগ্রতা দিদির স্নেহ-আলিঙ্গনে একেবারেই ঢাকা পড়ে' গিয়েছিল। কিন্তু এমন দিদি ও মুমূর্ষু ভাই ও শোকার্ত্ত স্নেহময় পিতামাতাকে ছেড়ে সে যে মরীচিকার পিছনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছিল তার জন্য তার নিজের লজ্জা ক্ষোভ ও অনুতাপ তাকে মুহুর্মুহু ধিক্কার দিচ্ছিল ও কষাঘাত কর্‌ছিল।

কম্পিত-পদে ও শঙ্কিত মনে ধীরা নীরাকে নিয়ে যখন বাড়ীতে ফিরে এল তখন বাড়ী নিস্তব্ধ। এই স্তব্ধতা অনুভব করে' ধীরার মনটা একবার ছাঁৎ করে' উঠ্‌ল; কিন্তু পরক্ষণেই সে আপনাকে সান্ত্বনা দিলে এই বলে' যে কিশোর নিশ্চয়ই ভালো আছে, নইলে অন্ততঃ মাঁর কান্নাও ত শোনা যেত।

ধীরা নিজেদের ঘরের দরজার সামনে এসে চুপি-চুপি নীরাকে বল্‌লে -তুই চট্‌ করে' কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিয়ে আয়, আমি এগুই……

নীরা অভিসারিকার অত্যুজ্জ্বল বেশ-ভূষায় সজ্জিত ছিল, দিদি সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে সে লজ্জায় মৃতপ্রায় হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের অন্ধকারের অন্তরালে গিয়ে লুকাল।

ধীরা উৎকণ্ঠিত আগ্রহে কিশোরের ঘরে প্রবেশ করে'ই দেখ্‌লে— কিশোরের মৃত্যু হয়েছে, তার মা কিশোরের পাশে মৃতকল্প হয়ে পড়ে' আছেন, হয়ত তাঁর মূর্চ্ছা হয়েছে; তার পিতা প্রাত্যহিক উপাসনার সময় যেমন করে' বসে' থাকেন তেম্‌নি করে' চোখ বুজে হাত জোড় করে' স্তব্ধ হয়ে কিশোরের মাথার কাছে বসে' আছেন, তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌ছে; আর কিশোরের পায়ের কাছে বিছানার উপর মুখ চেপে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌ছে ডাক্তার বনবিহারী।

ধীরা এতক্ষণকার নিরুদ্ধ বেদনা আর ধারণ করে' রাখ্‌তে পার্‌লে না, সে সেইখানেই বসে' পড়ে' কেঁদে উঠ্‌ল। তার কান্নার শব্দ শুনে ছুটে এসে তার দুপাশে বসে' উচ্চ-স্বরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল নীরা আর অনাথ। আর মতি বেনে এসে ঘরের ভিতর তাদের কান্না শুনে বাইরের বারান্দাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়্‌ল, তার চোখও শুষ্ক রইল না।

সেই রাত্রে নীরা স্বল্প নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন দেখ্‌লে সে যেন এক বেদিনী, শিকারে বেরিয়ে এক বাণে দুই পাখী শিকার করেছে; সেই পাখী দুটির মুখ ঠিক প্রচুর আর অনাথের মতন এবং তীরের ফলাটায় যেন মদনের মুখের আদল আসে। এই স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে সে কেঁদে উঠ্‌ল; তার ঘুম ভেঙে গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল।

কিশোরের মৃত্যুর দুদিন পরে জলধর-বাবুর বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক একটি ব্যাগ হাতে করে' উপস্থিত হয়ে জলধর-বাবুর হাতে একখানা পত্র দিলে। জলধর-বাবু পত্র পড়ে' ভদ্রলোককে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করে' বাড়ীর মধ্যে নিয়ে আস্তে আস্তে বল্লেন—মদন-বাবুর অশেষ অনুগ্রহ, আপনারও বিশেষ দয়া যে এতদূর কষ্ট স্বীকার করে' এসেছেন; কিন্তু আমার সেই ছেলেটি সকল রোগ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃত-লোকে চলে' গেছে……

নবাগত ডাক্তার ব্যথিত হয়ে সমবেদনা জানিয়ে বল্লে—আহা! তা হলে বিনা চিকিৎসাতেই ছেলেটি মারা গেল।

জলধর-বাবু ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠ্লেন—না না চিকিৎসার কোনোই ক্রটি হয় নি। ক্রটি অন্য কিছুতে হয়ে থাক্‌বে, তাই ভগবান্ তাকে আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিলেন।

সমস্ত পরিবার শোকসন্তপ্ত হয়ে থাকা সত্ত্বেও অতিথির অভ্যর্থনা ও সমাদরের কোনোই ক্রটি হল না। ডাক্তার জলধর-বাবুর সৌজন্যে প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে পরদিন কলকাতায় ফিরে গেল।

এর হপ্তাখানেক পরে জলধর-বাবুর বাড়ীতে আর-একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হয়ে আবার মদনের এক পরিচয়-পত্র দিলে। ইনি মদনের এটর্নি। মদন এই রুদ্রা গ্রামে একটি ছেলেদের স্কুল, একটি মেয়েদের স্কুল এবং একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ছয় লক্ষ টাকা দান করেছেন; স্কুল দুটি অবৈতনিক হবে এবং স্কুল ও হাঁসপাতাল ধীরার নামে পরিচিত হবে; এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি হবেন জলধর-বাবু বনবিহারী-ডাক্তার ধীরা আর গ্রামের আর দুজন মাতব্বর লোক এবং এই এটর্নি ও মদন নিজে; এই সাতজন ট্রাষ্টির মধ্যে কোনো এক জনের মৃত্যু হলে অথবা

কেউ এই কর্ম্মভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে অবশিষ্টগণের অধিকাংশের সুম্মতিক্রমে নূতন ট্রাষ্টি নিযুক্ত হবেন; এইরূপ বিবিধ সর্ত্তের দানপত্র একেবারে পাকা রেজেষ্টারী করে' নিয়ে মদনের প্রতিনিধি স্বরূপ এই এটর্নি জলধর-বাবুকে সেই দানপত্র দিতে এসেছেন।

জলধর-বাবুর মন পুত্র-বিয়োগে কাতর ও শোকাচ্ছন্ন হয়ে থাকা সত্বেও মদনের এই মহৎ দান দেখে তাঁর মন প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু সেই প্রফুল্লতার মধ্যেও একটি অতি সূক্ষ্ম দুঃখ অনুবিদ্ধ হয়ে রইল—সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধীরার নামে চিহ্নিত করাতে ধীরার প্রতি মদনের মনোভাব সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কন্যার ভাবে পিতা যতদূর বুঝ্‌তে পেরেছেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে ধীরা মদনের প্রণয় গ্রাহ্য না করে' প্রত্যাখ্যানই করেছে; প্রত্যাখ্যাত হয়েও মদনের এই মহৎ দান তার প্রণয়েরই মহত্ত্ব মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছিল, এবং তার এই নিঃস্বার্থ প্রণয়ের মহিমায় মণ্ডিত হয়ে মদন জলধর-বাবুর কাছে মহত্তর হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌ল; জলধর-বাবুর একবার মনে হল মদনের এই মহৎ প্রেমের পরিচয় পেয়ে তাঁর কন্যার মতি-পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই হবে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল বনবিহারী-ডাক্তার ধীরাকে একদিন ভালোবেসেছিল এবং ধীরাও বনবিহারীকে ভালোবেসেছিল; তাদের দুজনের মাঝখানে মদন এসে পড়াতেই হয়ত কি একটা গণ্ডগোল বেঁধে গেছে যাতে মনে হচ্ছে বনবিহারী ও ধীরার পূর্ব্বেকার অনুরাগ এখন আর নেই এবং মদনও ধীরার সেই অনুরাগ আকর্ষণ করতে পারেনি। এই-সব বিরুদ্ধ চিন্তায় বৃদ্ধের মনে দ্বিধা জেগে উঠ্‌ল—বনবিহারী ও মদনের মধ্যে কোন্ জন ধীরার জীবন-সহচর হবার যোগ্যতর। কিন্তু নবাগত অতিথিকে অভ্যর্থনা ও সমাদর করবার ব্যস্ততায় এবং গ্রামহিতকর অনুষ্ঠানের নেশায় এই দুরূহ সমস্যার

সমাধানের ভার কালের ও কন্যার উপর ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন।

ধীরা যখন শুনলে যে মদনের দানের সঙ্গে তার নাম বিজড়িত হয়ে থাকবে তখন সে লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠ্‌ল—তার মনে হল—"ছি ছি! বাবা মা না জানি কি মনে করছেন! আর......" আর তার মনে হচ্ছিল বনবিহারীর কথা, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ মন থেকে সেই চিন্তা দূর করে' ফেললে। সে তাড়াতাড়ি খবরের-কাগজ তুলে' নিয়ে পড়্‌তে প্রবৃত্ত হল। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় চোখ বোলাতে বোলাতে তার দৃষ্টি এক জায়গায় নিবদ্ধ হয়ে গেল, এবং সেই স্থানে কিছুক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থেকে সে কলম কাগজ টেনে নিয়ে চিঠি লিখ্‌তে বস্‌ল। চিঠি লেখা শেষ করে' আর-একবার পড়ে' ধীরা উঠে দাঁড়াল, কিসের একটা দৃঢ় সঙ্কল্পে তার মুখ গম্ভীর কঠোর হয়ে উঠেছে।

ধীরা নীরার কাছে গিয়ে নীরার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল। নীরা উৎসুক দৃষ্টি তুলে দিদির মুখের দিকে তাকিয়েই মনে মনে শিউরে উঠ্‌ল, কোনো কথা বল্‌তে সাহস করলে না। নীরার দৃষ্টিতে দৃষ্টি সম্মিলিত হতেই ধীরার মুখের কঠোর গাম্ভীর্য্য ধীরে ধীরে স্নেহ-কোমল হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। তাই দেখে সাহস পেয়ে নীরা মৃদু স্বরে ডাক্‌লে—দিদি!

ধীরা কোমল স্বরে বল্‌লে—নীরু, কিশোরের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলেই তোকে বিয়ে করতে হবে···অনাথ তোকে ভালোবাসে, তুই যদি অনাথকে ভালো নাও বাসিস তবু তুই তার কাছে চিরদিনের কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ; তুই কি তাকে স্বামী বলে' গ্রহণ করতে পার্‌বি না?

পূর্ব্বকৃত অপকর্ম্মের দারুণ লজ্জায় নীরার মাথা হেঁট হয়ে গেল, সে দিদির প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পার্‌লে না।

ধীরা সস্নেহে নীরার মুখ তুলে ধরে' তার আনত চোখের উপর করুণ কোমল দৃষ্টি ফেলে আবার স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—বল ভাই, তুই অনাথকে বিয়ে করবি, তা হলে বাবাকে বলে' আমি সব জোগাড় করি।

নীরা কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার বিয়েও কি সেই দিনই হবে?

ধীরা যেন কার কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে এনে হেসে উঠল এবং বললে—আমার বিয়ে? আমার বিয়ে কবে হবে জানি নে।

মদনের দানের কথা শুনে নীরার মনে হয়েছিল মদন-বাবুর সঙ্গে দিদির বিয়ে এবার নিশ্চয় অবধারিত; কিন্তু মদনের প্রসঙ্গ সে মুখে আনতে পারছিল না, মর্ম্মান্তিক লজ্জায় বাধছিল। সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে মৃদু স্বরে বললে—তোমার বিয়ে আগে হয়ে যাক্......

ধীরা হেসে বললে—আমার বিয়ের অপেক্ষায় থাকতে হলে তোমাকেও চিরকাল আইবুড়ো থাকতে হবে।

নীরা বিস্মিত ম্লান দৃষ্টি তুলে দিদির মুখের দিকে তাকালে।

ধীরা নীরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নেহমধুর স্বরে বললে—অনাথকে বিয়ে করতে আপত্তি করিস নে, বিলম্বও করিস নে—তুই সম্মতি দে লক্ষ্মীটি, আমি বাবাকে বলে' সব ঠিক করি।

নীরার দুই চোখ অশ্রুজলে ভরে' উঠল, সে গাঢ় স্বরে বললে—তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

ধীরা নীরার চোখ মুছে দিতে দিতে নিজের অশ্রুজল গোপন করে' বললে—তবে আমি বাবাকে বলি গে?

নীরা অস্পষ্ট স্বরে বললে—বলগে।

জলধর-বাবু গ্রামের কোথায় ছেলেদের স্কুল, কোথায় মেয়েদের স্কুল,

আর কোথায় বা হাঁসপাতাল হবে আর সেই-সব প্রতিষ্ঠানের বাড়ীই বা কেমন নক্‌সায় হবে তাই বসে' বসে' ভাব্‌ছিলেন, তাঁর চারিদিকে কাগজপত্র নক্‌সার খস্‌ড়া হিসাব এষ্টিমেট্‌ ইত্যাদি ছড়ানো রয়েছে। ধীরা ঘরে ঢুকেই সেই-সব দেখে লজ্জায় প্রথমতঃ লাল হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সাম্‌লে নিয়ে, সেখানে যেন তার নাম-সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যাপারের কিছুমাত্র নিদর্শন নেই এম্‌নি ভাবে সে পিতার নিকটে অগ্রসর হতে হতে মৃদু মধুর কণ্ঠে ডাক্‌লে—বাবা!

জলধর-বাবু কন্যার দিকে মুখ তুলে বল্‌লেন—কি মা?

ধীরা কিছুমাত্র ভূমিকা না করে'ই বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—নীরুর সঙ্গে অনাথের বিয়ে দিতে হবে......

জলধর-বাবু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন—অনাথের সঙ্গে?......

ধীরা ধীর দৃঢ় স্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ। অনাথ নীরুকে ভালোবাসে···

জলধর-বাবু চিন্তান্বিত হয়ে গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—কিন্তু নিরুর মনের ভাবও ত জান্‌তে হয়······

—আমি জেনেছি, নীরুও অনাথকে ভালোবাসে, সে তোমাকে বল্‌তে বলেছে......

জলধর-বাবু শঙ্কাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—এত তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা তোল্‌বার কি কোনো কারণ ঘটেছে?

ধীরা পিতার মনের আশঙ্কা বুঝ্‌তে পেরে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—না না, কারণ কিছু ঘটে নি; অনাথ ছেলেটি ভালো, আর দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে······

জলধর-বাবু আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লেন—অনাথ ভালো ছেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন কর্‌বার মতন তার ত অবস্থা নয়······

রূপের ফাঁদ

—নরসিং কাকার সমস্ত সম্পত্তিই ত সে পাবে হয় ত......

—এই হয়ত'র উপর নির্ভর করে'......

—আর তোমার যা সম্পত্তি আছে তাও ত সমস্ত নীরুই পাবে......

জলধর-বাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হেসে বল্‌লেন—তুমি ভুলে যাচ্ছ মা, যে, আমার দুটি মেয়ে আছে, দুটিকে ভাগ করে' দিলে......

ধীরা হেসে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লে—তোমার আর-এক মেয়ে ত মস্ত বড়লোক! তার নামে ত ছ ছ লক্ষ টাকা খয়রাতই হয়ে গেছে!

জলধর-বাবু কন্যার কৌতুকহাস্যের অর্থ বুঝ্‌তে না পেরে ম্লান হেসে বল্‌লেন—আগে ঘটকের নিজের ঘট্‌কালি পাকা হয়ে যাক্ তার পরে তার অপরের ঘট্‌কালির কথা শোনা যাবে।

ধীরা লজ্জিত হয়ে পিতার দৃষ্টির সাম্‌নে থেকে সরে' তাঁর পাশে গিয়ে অতি মৃদু স্বরে বল্‌লে—তার কোনো সম্ভাবনা নেই বাবা। আমি অনেক জায়গায় চাক্‌রীর দর্‌খাস্ত করেছি, শীগ্‌গিরই কোথাও চলে' যাব, যাবার আগে নীরুর বিয়েটা দেখে যেতে চাই।

জলধর-বাবু ব্যথিত দৃষ্টি কন্যার মুখের দিকে ফিরিয়ে বল্‌লেন—তোর চাক্‌রী কর্‌তে যাবার কি দর্‌কার হল মা?

ধীরা মৃদু স্বরে বল্‌লে—এ গ্রামে আমি আর থাক্‌তে পার্‌ব না, বাইরে কোথাও গিয়ে কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে।

জলধর-বাবু মাথা নত করে' চুপ করে' রইলেন, তাঁর চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে' জল ঝরে' পড়্‌তে লাগ্‌ল।

ধীরা ক্রন্দনস্ফুরিত-অধর দাঁত দিয়ে চেপে ধরে' ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। এই রুদ্রগ্রাম তার প্রিয় ভাইটির শ্মশান, তার নিজের

প্রেমের শ্মশান এবং তাকে নিবেদিত ও প্রত্যাখ্যাত প্রেমেরও শ্মশান; এই স্থান তার প্রিয়াধিক প্রিয়, আবার ভয়ানকেরও ভয়ানক! একে ত্যাগ করাও যেমন কঠিন, এখানে থাকাও তেম্নি কঠিন। সে এখনও বনবিহারীকে প্রবল অনুরাগে ভালোবাসে, কিন্তু তার সঙ্গে মিলনের পথ একেবারে বন্ধ—বনবিহারীকে আড়াল করে' দাঁড়িয়ে আছে ধীরার কল্পিত বনবিহারীর বিশ্বাসঘাতকতা ও দুশ্চরিত্রতা, এবং ধীরার পথ আগ্‌লে আছে কিশোরের সদ্যপ্রজ্বলিত চিতা! এই দুটিই ধীরার কাছে দুর্লঙ্ঘ্য ও দুরতিক্রম্য মনে হচ্ছিল।

*

* *

ধীরা মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর চাক্‌রী নিয়ে এলাহাবাদে চলে' গেছে। অনাথের সঙ্গে নীরার বিয়ে হয়ে গেছে। জলধর-বাবুর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে' নীরাকে দেওয়া হয়েছে, সেই উইলের প্রধান সাক্ষী ধীরা। জলধর-বাবু স্কুল হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে কন্যাকে প্রবাসে রেখে যেতে তিনি আস্‌তে পারেন নি; অনাথ এসে ধীরাকে রেখে গেছে।

অনাথ ফিরে যাওয়ার পর নীরা ধীরাকে চিঠি লিখেছে—"দিদি, উনি নিরাপদে এসে পৌঁচেছেন। মা বাবা ভালো আছেন।

পরীর বাড়ীতে যে বাবু থাক্‌ত সে চুরির দায়ে ধরা পড়েছে। তাই এখন জান্‌তে পারা গেছে তার নাম প্রণয়। পরী তার স্ত্রী নয়, সে কল্‌কাতার কিন্নরী থিয়েটারের একট্রেস্। প্রণয় তাকে কল্‌কাতা থেকে এনে এখানে রেখেছিল। প্রণয় কোন্ ব্যাঙ্কে কাজ কর্‌ত; পরীর

বিলাসের উপকরণ জোগাবার জন্যে সে ব্যাঙ্ক্ থেকে অনেক টাকা চুরি ক'রে আনে। পুলিশ যেদিন প্রণয়কে গেরেপ্তার করতে আসে সেদিন প্রণয় হাইড্রোসিয়ানিক্ এসিড্ খেয়ে মারা গেছে। পরীকে খুনের দায়ে আর চোরাই মাল রাখার দায়ে পুলিশে ধরে' নিয়ে গেছে। শুন্‌ছি তার জেল হবে। তার নাম পরী নয়, তার আসল নাম জগত্তারিণী, কিন্তু তাকে কল্‌কাতায় থিয়েটারের লোকেরা পান্না বলে' ডাকৃত। শুন্‌ছি পরীর বাড়ী আস্‌বাব সুদ্ধ নিলাম হবে ; নন্দ-জেঠা আর গোলক-কাকা ধীরা-স্কুলের জন্যে ঐ বাড়ীটা কিন্‌তে চাচ্ছেন ; বাবার পরামর্শ জান্‌তে এসেছিলেন। বাবা বলেছেন ভেবে চিন্তে পরে তাঁর মত জানাবেন। বাবা ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছেন না এই-সব ব্যাপারের মধ্যে তিনি লিপ্ত হয়ে থাক্‌বেন কি না। যার দানে স্কুল হাঁসপাতাল হবে সে যে মিথ্যাবাদী দুশ্চরিত্র তা ত নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেছে ; সে তার দানের সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে দিয়েছে এতে বাবা আরো অস্বস্তি বোধ কর্‌ছেন। কিন্তু তাকে নিবারণ করার কোনো উপায় ত অপরের হাতে নেই। কোনো দুশ্চরিত্র লোক যদি সৎকর্ম্মে কিছু দান করে তবে তার সেই দান সৎকর্ম্মে সফল করে' তুল্‌তে সাহায্য করা উচিত কি না এই দুর্ভাবনায় বাবা অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে আছেন।

বনবিহারী-বাবু গোড়া থেকেই এই দানের ট্রাষ্টি থাকৃতে অস্বীকার করেছিলেন তা তুমি জানো। তিনি না থাকাতে বাবা আরো বিব্রত হয়ে পড়েছেন, তিনি এর মধ্যে থাক্‌লে বাবা ট্রাষ্টি থাক্‌তে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌তেন ; নন্দ-জেঠা আর গোলোক-কাকার হাতে এতগুলো টাকা বিশ্বাস করে' ছেড়ে দিতে বাবা পার্‌ছেন না। বাবা বনবিহারী-বাবুকে ট্রাষ্টির কাজ স্বীকার কর্‌তে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি বাবাকে বলেছেন

তিনি এ গ্রামে আর বেশী দিন থাক্‌বেন না, শীগ্‌গিরই অন্য কোথায় চলে' যাবেন।

তোমার জন্যে আমরা সবাই খুব চিন্তিত থাক্‌ব, তুমি খুব ঘন ঘন পত্র দিও।

আমাদের ফেলি কুকুরটার পাঁচটা বাচ্চা হয়েছে। তুমি চলে' যাওয়ার পরদিন থেকে মিনি বেড়ালটাও কোথায় চলে' গেছে।

তোমার নাইট-স্কুলে এখন উনি আর আমি পড়াই। এই স্কুলের আমরা নাম রেখেছি ধীরা-পাঠশালা। সব ছেলে-মেয়েরাই জিজ্ঞাসা করে—বড়দিদি কবে ফিরে আস্‌বে। স্কুলের উঠানে তুমি যে কদমগাছ পুঁতেছিলে তাতে এবার ফুল হয়েছে। উনি বলেছেন ফুল ফুটলে পার্শেল করে' তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন। ইতি।

তোমার স্নেহের
নীরা।

এই চিঠি পড়ে' ধীরার মনে অনেক কথাই উদয় হল—নীরার কাছে চিরদিনের অনাথ হঠাৎ উনিতে পরিণত হয়ে গেছে, নীরার চিঠির মধ্যে বারম্বার কেবল উনি উনি উনি! পান্না মদন প্রভৃতি যে ভদ্রলোক নয় এ সন্দেহ তার অনেক দিন আগেই হয়েছিল। এই দুশ্চরিত্রা পান্নার জন্যে মারা গেল তার একটি মাত্র ভাই কিশোর, বনবিহারীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও প্রেম এবং বেচারা প্রণয়। মদনের রূপের-ফাঁদ থেকে বহু ভাগ্যে নারাকে উদ্ধার করা গিয়েছিল, নতুবা তারও পরিণাম কী ভয়াবহ ও শোচনীয় হত! এ কথা এখন নীরাও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছে, তাই সে এই চিঠিতে মদনের নাম একবারও উল্লেখ করে নি। বনবিহারী রুদ্রা-

গ্রামে আর থাক্‌বে না। কেন? সে-ও ত গ্রাম ছেড়ে চলে' এসেছে আস্‌বার সময়ও বনবিহারী একবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে নি। গাড়ীতে আস্‌তে আস্‌তে অনাথ বলেছিল ডাক্তার-দাদা কিশোরের চিতার কাছে বসে' কাঁদ্‌ছে। সে সেদিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে পারে নি। এ কান্না কিসের জন্য? তার অবহেলায় কিশোরের প্রাণ গেছে বলে'? পরচিত্ত অন্ধকার—ভগবান্‌ জানেন।

*

* *

কিছু দিন পরে ধীরার কাছে নীরার আর-একখানা চিঠি এল—দিদি, তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হলাম। বাবা মা ভালো আছেন। উনিও ভালো আছেন। আমিও।

বনবিহারী-বাবু কল্‌কাতা থেকে মার্বেল-পাথর আর মিস্ত্রি আনিয়ে কিশোরের চিতার উপর একটি সুন্দর বেদী তৈরী করিয়েছেন। তার একদিকে লেখা আছে "পরোপকারে আত্মদান" আর অপরদিকে লেখা আছে "দুর্ম্মতির বলিদান"! কাল রাতে হঠাৎ তিনি কোথায় চলে গেছেন; একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, তাতে শুধু এই-টুকু লেখা— "এখানে আমার যা কিছু জিনিস আছে সমস্তই আমার সেবক-বন্ধু হরিচরণ বাগ্‌দীকে তার ঐকান্তিক যত্নের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার স্বরূপ দান কর্‌লাম। —বনবিহারী।" তাঁর চাকর হরে বাগ্‌দী সেই চিঠি হাতে করে' গাঁময় সকলকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে আর ভেউ ভেউ করে' কাঁদ্‌ছে। ডাক্তার-দাদা চলে' যাওয়াতে আমরা সবাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি, আশ্চর্য্যও

হয়েছি। দিদি, একটা কথা বল্‌ব, তুমি রাগ করো না ; আমাদের মনে হচ্ছে তোমার অবহেলা-উপেক্ষাতেই তিনি দেশত্যাগী হয়ে গেছেন। ইতি-

তোমার স্নেহের

নীরা।

এর কিছু দিন পরে একদিন ধীরা গাড়ী করে' স্কুলে ঢুক্‌ছে, দেখ্‌লে— গেটের সাম্‌নে রাস্তার ওপারে খাকী রঙের মিলিটারি ড্রেস্ পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথায় কার্ণিস বার করা টুপি আর চোখে নীল চশ্‌মা থাকাতে তার মুখ বেশ স্পষ্ট দেখা গেল না, আর তাকে ভালো করে' দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌বার আগেই গাড়ী স্কুলের গেটের ভিতর ঢুকে' গেল। কিন্তু সে আচম্‌কা যেটুকু দেখেছিল তাতেই ধীরার সন্দেহ হয়েছিল যে সে বনবিহারী। তখন জার্ম্মানীর সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ সদ্য লেগেছে, অনেক দেশী ডাক্তারকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হচ্ছে। এই মনে হওয়া মাত্রই ধীরার মনটা ছাঁৎ করে' উঠ্‌ল, তার মনে হল বনবিহারী তাকে দূর থেকে শেষ দেখা দেখে নিয়ে আত্মহত্যা কর্‌তে চলেছে! এই কথা মনে হতেই ধীরা ব্যস্ত হয়ে গাড়ী থেকে নেমেই ছুটে স্কুল থেকে বাইরে বেরিয়ে এল—ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের কৌতূহলী দৃষ্টি ও উৎসুক প্রশ্নের দিকে লক্ষ্য কর্‌বার মতন মনের অবস্থা তখন তার ছিল না। ধীরা ছুটে বাইরে এসে দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই! রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করে' উচ্চ স্বরে বনবিহারীকে ডাক্‌তে তার ইচ্ছা কর্‌ছিল, কিন্তু লোক-লজ্জায় তার বাধ্‌ল, স্কুলের গেটের কাছে ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের ভীড়

জলতরঙ্গ ষ্টীমলঞ্চে রূপের ফাঁদে—নীরা।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

Gava Art Press, Calcutta.

করে' উঁকি মারা দেখে ম্লান মুখ লাল করে' ধীরা অপরাধীর মতন ধীরে ধীরে স্কুলের গণ্ডির বন্দীশালায় ফিরে গেল, তার চিত্ত তখন নীরবে হাহা-কার করে' কবিগুরুর মেঘ ও রৌদ্র গল্পের নায়িকা গিরিবালার অন্তরের প্রতিধ্বনির মতন আর্ত্তনাদ করছিল—

'এস এস ফিরে এস—নাথ হে ফিরে এস।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে ফিরে এস!
ওগো নিষ্ঠুর ফিরে এস, হে আমার করুণ কোমল এস!
আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্ত সুন্দর ফিরে এস!
আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস!
আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন-ধন অন্তরে ফিরে এস!'

ধীরা বনবিহারীকে একবার দেখা করবার জন্যে কাতর অনুনয় করে' কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, কিন্তু বনবিহারীর কোনো সংবাদই আর পাওয়া গেল না। সেই দিন থেকে ধীরার প্রধান কাজ হল অনেক খবরের কাগজে তন্ন তন্ন করে' খুঁজে দেখা যুদ্ধযাত্রী ও যুদ্ধে হতাহত লোকদের তালিকায় বনবিহারীর নাম আছে কি না। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ধীরা বনবিহারীর কোনো উদ্দেশ পায় নি।

শেষ

এই লেখকের লেখা

১। স্রোতের ফুল	২।	২৩। রত্নাবলী	(সচিত্র)	।৵০
২। পরগাছা	১৸০	২৪। রাবেয়া		।০
৩। যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী	১৲	২৫। পারস্য উপন্যাস (সচিত্র)		৸০
৪। হেরফের	১৸০	২৬। রবিনসন্ ক্রুশো (সচিত্র)		১।০
৫। চোরকাঁটা	২৲	২৭। ঈশপের গল্প	(সচিত্র)	১৲
৬। আলোক-লতা	১॥০	২৮। পারণ	(সচিত্র)	॥০
৭। বিয়ের ফুল	১৸০	২৯। জোড়বিজোড়		১॥০
৮। দুই তার	১॥০	৩০। কবিকঙ্কন চণ্ডী (সটীক)		১০৲
৯। আগুনের ফুল্কি	১৲	৩১। নষ্টচন্দ্র	(যন্ত্রস্থ)	
১০। পঙ্কতিলক	১॥০	৩২। হাইফেন	(যন্ত্রস্থ)	
১১। দোটানা	২॥০	৩৩। দোরোখা	(যন্ত্রস্থ)	
১২। মুক্তিস্নান	৩৲	৩৪। মন না মতি (যন্ত্রস্থ)		
১৩। সর্ব্বনাশের নেশা (সচিত্র)	১॥৵০	৩৫। জয়শ্রী	(যন্ত্রস্থ)	
১৪। সওগাত	১।০	৩৬। নোঙর-ছেড়া-নৌকা		৩৲
১৫। ধূপছায়া	॥৶০	৩৭। অদর্শনা		১।০
১৬। চাঁদমালা	১৲	৩৮। মহাভারত (কাশীরাম দাসের, সচিত্র)		৩॥০
১৭। মণিমঞ্জীর	॥০	৩৯। ভারতের জন্মকথা (পদ্য, সচিত্র)		৸০
১৮। পুষ্পপাত্র	১।০	৪০। বেদবাণী (বেদ পরিচায়ক গদ্যপদ্যময় পুস্তক)		৩৲
১৯। কনক চুর	॥০			
২০। বরণডালা	॥০			
২১। বিষ্ণুপুরাণ (সচিত্র)	॥৵০			
২২। কাদম্বরী (সচিত্র)	॥৵০			

১৭। চরকার উৎসব—শ্রীমতী সরসীবালা বসু ১৲ মাঃ
১৮। মণিবেগম—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী ... ১৲ „
১৯। রাজপুতের মেয়ে—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲ „
২০। লক্ষ্মীর কৌটা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) ১৲ „
২১। স্বপ্নবাণী—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ... ১৲ „
২২। পরাজিতা—স্বর্গীয়া ইন্দিরা দেবী (২য় সং) ... ১৲ „
২৩। কলা-বৌ—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) ... ১৲ „
২৪। রাণীর শিরোপা—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲ „
২৫। মণির বর—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (৫ম সং) ১৲ „
২৬। মোটর-ডাকাতি—শ্রীক্ষেত্রমোহন ঘোষ ... ১৲ „
২৭। সতী সাবিত্রী—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১৲ „
২৮। সোনার খনি—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ... ১৲ „
২৯। সোনার কাঠি—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়(২সং)১৲ „
৩০। সই—শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া ... ১৲ „
৩১। সোনার খনি—(২য় খণ্ড) শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ১৲ „
৩২। জগদ্ধাত্রী—শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৲ „
৩৭। প্রিয়া—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (বসুমতী সং) (৩য় সং) ১৲ „
৩৮। অনুরাগ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) ১৲ „
৩৯। পল্লীবধূ—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় (২য় সং) ১৲ „
৪০। বাঙ্গালীর মেয়ে—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ২য় সং ১৲ „
৪১। সোনার পদক—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) ১৲ „
৪২। রূপের মোহ—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় (২য়সং) ১৲ „
৪৩। যুগল মিলন—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ১৲ „
৪৪। সতীর মূল্য—শ্রীমনোমোহন রায় (রিজিয়া প্রণেতা) ১৲ „
৪৫। দেবতার দান—শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲ „
৪৬। শ্রীমতী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ... ১৲ „
৪৭। প্রেমিকা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (২য় সং) ... ১৲ „
৪৮। প্রেয়সী—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (৩য় সং) ... ১৲ „